প্রতিটি প্রাণ নিশ্চয়ই নেবে মৃত্যুর স্বাদ। হাশরের দিন তোমরা পাবে তোমাদের কৃতকর্মের ফল। পুরোপুরি। যাকে আগুন থেকে রাখা হবে দূরে আর ঢোকানো হবে বাগানে সেই পেলো সাফল্য। দুনিয়ার জীবন তো শুধু ছলনার।

—সুরা আল ইমরান



মৃত্যুর ওপারে

পথ, প্রকাশ
৬৯, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০।

মৃত্যুর ওপারে পথ প্রকাশ

ইস্টার্ন কটেজ
১০, পরিবাগ, অ্যাপার্টমেন্ট-৮০২
ঢাকা-১০০০
বা
বিবিটিটি
১০০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
বিমান ভবন, ছয়তলা,
ঢাকা-১০০০

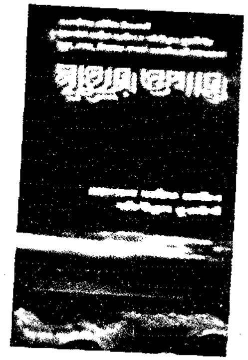
পথ প্রকাশ
৬৯, প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

'আনন্দ বিনাশী মৃত্যুকে স্মরণ করো। বেশি করে।'
-আল হাদীস



মৃত্যুর ওপারে

তাবলিগের জীবিত কিংবদন্তী মাওলানা তারিক জামিলের মৃত্যু ও মহাপ্রলয় সম্পর্কে মর্মবিদারী আলোচনা।



মৃত্যুর ওপারে

গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাবলীগ জামাতের কিংবদন্তী পুরুষ জগদ্বিখ্যাত মাওলানা তারিক জামিলের মৃত্যু ও মহাপ্রলয় সম্পর্কে অসামান্য আলোচনা।
অনুবাদ ঃ শফিউল্লাহ কুরাঈশী।

এক

খুতবার শেষে পড়লেন ---

'নিশ্চয় মানুষ মরণশীল'।

যে জন্মেছে সে মরবে।

মরণের স্বাদ তাকে পেতেই হবে। যদিও সে দুর্গম দুর্গে থাকে। মৃত্যুর দোলনায় দুলছে মানুষ আর জ্বিন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন--

'হে জ্বিন ও মানুষ' যদি আমার আদেশ মানতে তোমাদের ভালো না লাগে। তবে বের হয়ে যাও। আকাশ আর জমিনের সীমানার বাইরে। কিন্তু কখনই তোমরা পারবে না বেরিয়ে যেতে আমার রাজত্ব থেকে।'

হাসপাতালে যান। দেখুন মৃত্যু যাতনায় ধুঁকছে রোগী। শুনুন তার আর্তনাদ। মরণ যন্ত্রণায় কাতর সে। কী যে তার কষ্ট সে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। ডাক্তার এসে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উচাটন করে ফেলেছে তাকে। বড় আশা নিয়ে ঢুকেছিল সে এখানে। প্রথম ভাবতো ডাক্তারই বুঝি তাকে সারিয়ে তুলবে। কিন্তু সে হারিয়ে ফেলে বিশ্বাস। সে দেখে তার পাশের বেড়ে রুগী ধুঁকতে ধুঁকতে মারা গেল। একই ডাক্তারের চিকিৎসায়। সে রয়েছে বেঁচে। হয়ে উঠছে সুস্থ। বুঝতে পারে বাঁচা আর মরা আল্লাহতায়ালার হাতে। প্রতিদিন প্রতিটি হাসপাতাল আর শত শত ক্লিনিক থেকে একদিকে বের হচ্ছে লাশ। আরেকদিকে বেরিয়ে আসছে সুস্থ মানুষ।

মৃত্যুকে দেখুন। যাত্রা পথে। কিভাবে ওৎ পেতে থাকে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী সাহেব আধঘন্টা আগেও জানতে পারেননি কি ভয়াবহ মৃত্যু অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। গোসল সেরেছেন, চুল আঁচড়েছেন, নাশতা করেছেন। স্ত্রীপুত্র পরিজন বিদায় দিয়েছে হাসিমুখে। চেহারা, চলা-ফেরা কোথাও ছাপ পড়েনি মৃত্যুর। উড়োজাহাজে উঠেছেন। রানওয়ে ছেড়ে হাওয়ায় পাখা মেলে দিয়েছে বিমান। পার হয়েছে সময়। মিনিটের পর মিনিট। মেঘের রাজ্য পাড়ি দিয়ে উড়ে চলেছে বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান। কতো কী স্বপ্ন দেখে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আচমকা কানফাটা আওয়াজ।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভেঙে চুরে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল ইস্পাতের খোল, মানুষের রক্ত, বিস্ফোরক দ্রব্য মাখা হাড় গোশ্‌ত।

মরণ!

ভাই এর নাম মৃত্যু।

মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে এড়াবে কে?

কী দিয়ে?

টাকা, রুপী, পাউণ্ড, ডলার, মার্ক, ফ্রাঙ্ক আর ইয়েন?

মৃত্যুকে দেখুন। পঙ্গু হাসপাতালে।

মানুষের আর্তনাদ, আর্ত চিৎকারে ভারি হয়েছে সেখানের বাতাস। কারো হাতের, কারো পায়ের, কারো ঘাড়ের হাড় ভেঙে গেছে। কারো হয়েছে গ্যাংগ্রিন। পচন। একটু একটু করে কাটা পড়ছে তার পা কিংবা হাত। প্রচন্ড যন্ত্রণায় প্রাণ তার যায় যায়।

তাপর হঠাৎই একদিন ঊর্ধে চলে গেছে সে।

মরণ ছুঁয়েছে তাকে।

মৃত্যুকে দেখুন। কবরস্থানে।

আধ্যাত্মিক সাধক আমির খসরু বলেন-

একবার কবরস্থানে গিয়ে আমি বিদায়ী বন্ধুর
স্মরণে কেঁদে বলি, 'তোমরা কোথায়?'
আমার আত্মার বন্ধুরা সবাই কী মধুর
স্বরে শুধু বলেছিল, 'তোমরা কোথায়?'

যাকে 'দ্বিতীয় ওমর' বলা হয় সেই ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি এক জানাজাতে ছিলেন। লাশ কবরস্থানে নেয়া হলো। সাথে গেলেন ওমর ইবনে আবদুল আজিজ। তিনি বিষণ্ন। নিরালা একটা জায়গায় বসে আছেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

একজন মানুষ। কাছে এলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমাদের খলিফা' এই জানাজার প্রধান আপনি। আর আপনি এখানে? একাকী?

খলিফা বললেন, 'আমি কবরের কথা শুনেছি।'

'কবরের কথা?'

'হ্যাঁ।' তিনি নিচু স্বরে বললেন, 'সে আমাকে বলল, "হে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, হে মুসলমানদের খলিফা! আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না যে, আমার কাছে যারা আসে আমি তাদের সাথে কী ব্যবহার করি?"

আমি বললাম, 'বলো।'

কবর বললো, 'আমি তাদের কাফনের কাপড়ে পচন ধরাই। পরে ফেড়ে ফেলি। তাদের শরীর ছিঁড়ে ফেলি। টুকরো টুকরো করে দেই। খুন চুষে নিই। গোশত খেয়ে ফেলি। আরো শোনো, তার দেহের বাঁধন গুলো খুলে ফেলি। কাঁধ থেকে আলাদা করি হাত। কব্জি থেকে ছিঁড়ে ফেলি বাহু। রানকে হাঁটু থেকে হাঁটুকে উরু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিই।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ চুপ করলেন। গভীর বিষাদের ছায়া পড়লো তাঁর চেহারায়। ভিজে উঠলো চোখ। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামলো নিরব কান্না।

অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। অঝোরে।

তারপর কাণ্ণাভেজা স্বরে বললেন, 'দুনিয়া দু'দিনের। আর এর ছলনা অনেক বেশি। যে এখানে পেয়েছে বেশি সম্মান ওপারে তার হবে অনেক অপমান। আজ এখানে যে ধনী ওখানে দাঁড়াবে সে ফকির হয়ে। এখানের যুবক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় বুড়ো। মৃত্যু লুকিয়ে থাকে এখানে কাছে। পাশেই। হানা দেয় আচমকা। লুটে নেয় প্রাণ। এখানের প্রাণ হারিয়ে যায় শীঘ্রই।

এই ধোঁকাবাজের প্রতারণায় পড়ো না।

তোমরা দেখছো কতো তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে খুবই বোকা যে তার ধোঁকায় পড়ে যায়।

বলো, ওই সব নাম করা রাজা বাদশারা কোথায়? তারা বড় বড় শহর তৈরি করেছিল। কতো মিষ্টি পানির পুকুর আর ঝর্ণা খুঁড়েছিল। ফুলে ফলে সুশোভিত বাগান আবাদ করেছিল। সুরম্য সব অট্টালিকা আর প্রাসাদ রচনা করেছিল। তার ভেতরে বাইরে সাজিয়েছিল চোখ ঝলসানো পাথর আর রঙ দিয়ে।

কে বাস করে আজ সেখানে?

এর স্রষ্টারা আজ কোথায়?

এখানে বাস করে তার উত্তরাধিকার। তাদের পাপ ছুঁয়ে যায় এর মালিককে।

এর স্রষ্টারা খুব অল্প ক'দিন ছিল এখানে।

সব ফেলে চলে গেছে। পড়ে আছে নির্জন কবরে। সেখানে গাঢ় আঁধার। বাতাস নেই। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নেই। আনন্দ নেই।

আল্লাহতায়ালা তাঁর অসীম দয়ার কারণে এইসব মানুষকে দিয়েছিলেন সুন্দর চেহারা। সুঠাম দেহ। তারা বুঝতো না যে কোনো সময় কেড়ে নেয়া হবে এটা। শয়তান ধোঁকা দিয়েছিল তাদের। তারা জড়িয়ে পড়েছিল পাপাচারে। আল্লাহর নেয়ামতকে খরচ করেছিল খারাপ পথে।

শপথ মহামহিম আল্লাহতায়ালার! তিনি ওদেরকে দিয়েছিলেন অঢেল সম্পদ। সেজন্যে সবাই হিংসা করতো। তারপরও ওরা কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনি। তারা কামাই করতো হারাম রাস্তায়। খরচ করতো পাপের পথে।

এখন দেখো!

কী অবস্থা ওদের!

মাটি তাদের দেহকে পচিয়ে ফেলেছে। খুলে খুলে পড়ছে হাড় থেকে গোশত্। বিষাক্ত পোকা-মাকড় ঢুকে পড়েছে হাড়ে। তাদের সেই হারাম টাকায় কেনা খাবার থেকে তৈরি শক্তিশালী হাড়ের ক্ষমতা শেষ।

ওরা এই দুনিয়ার বুকে দামী আর উঁচু পালঙ্কে ঘুমাতো। বিছানা ছিল নরম। চাদর ছিল কোমল। চারপাশে থাকতো সেবক। চাকর বাকর। সময় আসতো ঘুমের। তারা হাত পা টিপে দিত। নরম কোমল উঁচু দুগ্ধ ফেননিভ বিছানায় তলিয়ে যেত ঘুমের দেশে।

এরা ছিল ধনী। তাই দিন রাত এদের চারপাশে চাটুকাররা ঘুরে বেড়াতো। মন জোগাতো।

আর আজ?

সেদিন আর নেই।

এখন ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো। 'কেমন আছে ওরা?'

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করো। 'কী করে গরিবদের নোঙরা শরীরের সাথে পড়ে আছে একই মাঠে?'

প্রশ্ন করো, 'ধনীরা! কী কাজে এসেছে তোমাদের ধন?'

প্রশ্ন করো, 'হে দরিদ্র! বলে। কী ক্ষতি হয়েছে যে সম্পদ পাওনি?'

দেখো, এখন কী অবস্থা ওদের!

ঠোঁট, জিভ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে কতো কথাই না বলতো?

চোখ দিয়ে দেখতো রঙিন পৃথিবী। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, হলুদ, বেগুনী আর কমলা। কতো রঙ। কত তৃপ্তি! ছিল তরবারির মতো ভ্রু। ঘন, লম্বা পাপড়ি। ঝকঝকে সাদা জমিনে কালো, বাদামী, সবুজ মণি। নারীর চোখের দৃষ্টিতে আলোড়ন উঠতো পুরুষের হৃদয়ে। সে চোখের আজ কী দশা!

অক্ষি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে মণি। গলে পচে খসে গেছে পাতা আর পাপড়ি।

এদের চোখ ঝলসানো চেহারা, লাজুক শরীর যা সামান্য দ্বীনি কষ্ট সহ্য করতে তৈরি ছিল না আজ কোথায়?

কোথায় তাদের নরম, উজ্জ্বল চামড়া?

কীট আর পোকা কুরে কুরে খেয়েছে অহঙ্কারী দেহকে। পুড়ে গেছে গায়ের আলোকিত রঙ। মাংস খেয়ে ফেলেছে মাটি। মুখ ভরে গেছে মাটিতে।

ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। শরীরের জোড়া খুলে ফেলেছে। টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। গলে পচে খসে খসে গেছে মূল্যবান সেই শরীর। যা চলতো গর্বভরে। হাঁটতো মাথা উঁচু করে। অত্যাচার আর অবিচারের হাতিয়ার ছিল।

আহ! দুঃখ ! কি! পরিণতি হচ্ছে তোমাদের?

কোথায় তোমাদের সেই সব চাকর বাকর?

তুমি ডাকতে। তারা তড়িৎ জবাব দিত 'জ্বি, হুজুর!' তোমার ভয়ে ছুটে আসতো। তোমার ভয়ে আমার নাফরমানী করতো।

কোথায় তোমাদের সেই সব অট্টালিকা? সাজানো গোছানো সংসার? আরাম আয়েমের বিলাস ভবন?

তোমাদের ধন সম্পদ কোথায়?

চাকর বাকরদের বলো তারা যেন তোমার কামাই করা টাকা-পয়সা দিয়ে চারটা ডালভাত, কিছু খাবার নিয়ে এসে পৌঁছে দেয় তোমার কাছে। তোমার তৈরি করা আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে আছে ছেলে মেয়েরা। আত্মীয় স্বজনেরা। তুমি তাদের চিৎকার করে হুকুম করো যেন তোমার জন্যে আরামের বিছানা এনে দেয়। তুমি এই নির্জনে, এই রুদ্ধশ্বাস কবরের আঁধারে একটু বিশ্রাম নাও।

কই, ডাকো তাদের?! আল্লাহকে ভুলে যাদের জন্যে সবকিছু করেছো? আজ তোমার ডাকে সাড়া দিচ্ছে কি?

আসছে?

হায়, হায়!

তোমার কামাই করা সম্পদে তৈরি বাগানে ফুটেছে আজ কতো ফুল। রঙ বেরঙের পাতা, সুমিষ্ট ফল।

ওদের বলো, তারা যেন তোমাকে কিছু দেয়! কবরে ফুল দিক। সুরভিত। ফল দিক। খাবার।

দিচ্ছে?

দেয় না?

তোমার আর্ত চিৎকার, হাহাকার পৌঁছে না ওদের কানে।

তোমাকে আর্ত চিৎকার, হাহাকার পৌঁছে না ওদের কানে।

তোমাকে ভুলে গেছে ওরা!

তোমার স্ত্রী।

তোমার সন্তান।

তোমার বন্ধু। বান্ধব।

সব।

সবাই!

কবরবাসী!

আজ তোমরা একা!

গাঢ় আঁধার ঘিরে আছে তোমাদের । এই পৃথিবীতে হচ্ছে রাত আর দিন। তোমাদের সবই সমান। তোমাদের বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছে। তোমাকে ছেড়ে।

সুখ দুঃখ শোনার লোক আজ আর তোমার নেই।

তুমি একা। একবারে একা।

কতো সুন্দর দেহ তোমার। কতো সযত্নে লালিত পালিত আদরের দুলাল তুমি।

আজ আর কেউ নেই। পাশে।

ধুলি ধুসরিত তোমার দেহ। পচা গলা দুর্গন্ধে ভরা তোমার শরীর। পুঁতিগন্ধময়।

কে ছোঁবে তোমাকে?

কে ভালবাসবে?

তোমার দেহ ছিন্নভিন্ন। খুলে গেছে শরীরের জোড়া। চোখ বের হয়ে ঝুলে পড়ে আছে মুখের ওপর। ঘাড়, মাথা আলাদা হয়ে গেছে। নাকে ঢুকছে মাটি। মুখ ভরে জমেছে পানি আর পুঁজ। শরীরের সবখানে চরে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত কীট।

আর ওদিকে?

তোমার সুন্দরী বউ বিয়ে করেছে আরেক জনকে।

তোমার সুদর্শন স্বামী আনন্দে আছে আরেক অপরূপাকে নিয়ে।

আজ আর তোমার কথা মনে নেই তার। মুছে ফেলেছে সুখের সব স্মৃতি।

তোমার সন্তানেরা?

তারা তাদের এই মাত্র বিয়ে করা বউ নিয়ে খুশি। তুমি কেমন আছো তা দিনেও একবার ভাবে না, রাতেও না। তোমার রক্ত, ঘাম আর বুকের পাঁজর ভাঙা পরিশ্রমের পয়সায় তৈরি প্রাসাদ। সেখানে কোথায় তোমার স্মৃতি? সব কামরা থেকে মুছে ফেলেছে ওরা তোমার চিহ্ন।

তোমার ফেলে আসা জমি-জায়গা, ঘর বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সন্তানদের মাঝে আজ ঝগড়া ঝাঁটি কলহ-বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি।

এমনকি খুন পর্যন্ত হয়ে গেছে!

তোমার এক সন্তান অন্যের রক্ত পিপাসু।

কবরবাসী!

আগামীকাল ছিল তোমার মৃত্যুদিন। তুমি তার আগের দিন জানতে না। ধোঁকায় ছিলে তুমি! ভেবেছিলে দুনিয়া চিরদিন তোমার সাথে থাকবে। এটা বিদায়ের ঘর। ভুলে গিয়েছিলে তুমি।

তুমি ভাবতে পারেনি তোমার এই সুবিশাল বাড়ি, বাগানের পাকা ফল, নরম আরামের শয্যা, শীত আর গরমের পোশাক সব ফেলে চলে যেতে হবে।

হঠাৎ।

একদিন।

আসবে আজরাইল।

তুমি ভিক্ষা চাইবে প্রাণ।

কিন্তু আজ আর কোনো কিছুই আটকাতে পারবে না তাকে।

অমোঘ নিয়তি। চলে এসেছে তোমার কাছে। দেখতে পাচ্ছো তুমি সবই। বুঝতে পারছো। আবার ফিরে যেতে চাইছো ভালবাসার পৃথিবীতে। একটু পূণ্য করতে। স্মরণ করতে আল্লাহকে। মানতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদর্শকে।

কিন্তু আর যে সময় নেই আজ!

ফেরার আর কোনো পথ নেই।

যেতে হবে চলে।

হায়! হায়!

যদি আগে বুঝতে! যদি শুনতে!

আজ।

ভয়ে কাঁপছো তুমি। থর থর করে।

তোমার চোখ বড় বড় হয়ে উঠছে। বিস্ফারিত।

তোমার আশপাশে কতো আত্মীয়, সুহৃদ, হিতার্থী, শুভাকাঙ্খী। কেউ দেখি উদ্ধার করতে পারছে না তোমাকে! এই সীমাহীন কষ্ট থেকে। কেউ বুঝতেই পারছে না দেখি!

হায়!

যিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারতেন তাঁকে ভুলেছিলে তুমি! একবারও মনে করোনি তাঁকে। পরম প্রভু! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে?

কী জিনিস, এতো উদাসীন করেছিল তোমাকে?

কার ভালবাসায় ভুলেছিলে অন্তহীন প্রেমের পরম প্রভুকে?

তারা আজ কোথায়?

কেউ কিছু করতে পারছে না। একটু সাহায্য। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা একটু কমিয়ে দিতে পারছে না কেউ।

আহ্!

দেখো কারা তোমাকে মুগ্ধ করেছিল?

তুমি মন্ত্রমুগ্ধ ছিলে সব জড়, অসার শক্তির।

কই, দেখি আজ উদ্ধার করুক তোমায়!

নির্জিব, অসহায় সব উপাস্য।

ধন-সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, বাড়ি-ঘর, মোড়ল-সর্দার।

কোথায় তাদের ক্ষমতা!

নেই।

ভুল ভাঙছে তোমার।

আহ্! ক'দিন আগে যদি ভাঙতো!

মৃত্যুদূত এসেছে।

তুমি। ভীত। সন্ত্রস্ত।

ঘেমে নেয়ে উঠেছো। অসাড় পড়ে আছো। ঘামের পর ঘাম আসছে। পিপাসা লেগেছে। কে দেবে পানি? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পানি পান করালেও পিপাসা মিটবে না।

ছটফট করছো।

করোট বদলাচ্ছো।

গলার কাছে কাঁটা!

বের হচ্ছে না। নামছে না!

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'যখন প্রাণ এসে হাজির হয় কন্ঠার কাছে! কেন পারো না তোমরা ফেরাতে তা?'

ক'দিন আগে।

ছিলে তুমি দুনিয়ায়। আলো, বাতাসে আর ভালবাসায়। তখন মৃতদের চোখ বন্ধ করে দিয়েছো। গোসল দিয়েছো। কাফন পরিয়েছো। জানাজা পড়েছো। কবরে রেখে চাপা দিয়েছো মাটি।

আর আজ!'

এমন অনেক কথা বললেন আখিরাতের পথিক দরবেশ বাদশাহ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ। তারপর দুটো পঙক্তি পড়লেন-

'মানুষ এমন জিনিষে খুশি হয় যা খুব তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। সে মগ্ন থাকে বড় আর লম্বা আশায়। ওহে আহাম্মক! স্বপ্নের ঘোরে আছো তুমি। স্বপ্নের আনন্দে তুমি বিভোর। এমন ক'রোনা। উদাসীনতায় কেটে যায় তোমার দিন, রাত কাটে ঘুমের ঘোরে। আর মরণ চেপে বসে আছে তোমার কাঁধে। যেসব কাজে দিন কাটাচ্ছ কাল তার জন্যে করবে পরিতাপ। দু'দিনের দুনিয়ায় দিন কাটাচ্ছ তুমি চারপেয়ে জানোয়ারের মতো।'

•

হপ্তা খানেক পর।

এক দুপুর।

রাখাল বালক বকরি চরাচ্ছে। মরু উপত্যকায়। সাথে সাথী ইহুদি রাখাল। রুক্ষ মরু। চারদিকে ঘন বন। প্রচন্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য। যেন মাথার ওপর নেমে আসবে এখনি। চামড়া পোড়া গরম। দিশেহারা বোধ করছে রাখাল।

হঠাৎ।

তুন থেকে ছোঁড়া তীরের মতো ছুটে এলো সে। হিংস্র বাঘ! আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আত্মা কাঁপানো প্রচণ্ড গর্জন তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো পালে। চিলের মতো ছোঁ মেরে একটা ছাগল পাল থেকে নিয়ে অদৃশ্য হলো বনে। চোখের পলকে।

এখনো বাতাসে শোনা যাচ্ছে বাঘের গোঙানি।

কিন্তু একি! ইহুদি সঙ্গী রাখাল অবাক হলো।

মাথার পেছনে হাত দিয়ে মুখ আকাশে তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো মুসলমান রাখাল।

'প্রাণে বেঁচে গেছি! জানের ফাঁড়া কেটেছে মালের ওপর দিয়ে। বকরি গেছে মাত্র একটা। এতে কাঁদার কী আছে?' ভাবছে ইহুদি রাখাল। অবাক হয়ে।

হাহাকার করা শব্দে কাঁদছে রাখাল।

'কাঁদছিস কেন?' ইহুদি শুধায়, 'জানে বেঁচে গেছিস। মাত্র একটা বকরি গেছে তোর।'

কেঁদেই চলেছে মুসলিম।

'বকরি হারানোর দুঃখে কাঁদছি না।' খানিকপর থিতিয়ে এলো তার কান্না।

'তাহলে?'

'কাঁদছি এজন্যে যে খলিফা ওমর ইবনি আবদুল আজিজ আর নেই!

'এটা কেমন কথা!?'

'ঠিকই বলছি।' চোখ মুছে গভীর বিষাদে বলে মুসলিম।

'যদি তিনি বেঁচে থাকতেন বাঘ ছাগলকে আক্রমণ করতে সাহস পেত না।'

হ্যাঁ, তখনি ওমর ইবনি আবদুল আজিজ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

তাঁর স্ত্রী বলেন, 'খলিফা হবার পর তিনি আর রাতে ঘুমাননি। সারা রাত কাঁদতেন। নামাজে, দোয়ায়, সিজদায় আর তিলাওয়াতে। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ, দজলার ওপর যে পুল সেখানে যদি নির্জনে একজন বাঘ অন্য এক বকরির দিকে কড়া নজরে তাকায় তাহলে তার জবাব কাল হাশরের মাঠে আমাকে দিতে হবে!" খলিফা হবার আড়াই বছরের মাঝে একদিনও তিনি ফরজ গোসল করেননি!'



দুই

এখন ভাই,

চিন্তা করে বলুন আমরা কোথায়?

কতো সময় আল্লাহর পথে দেয়া উচিত।

মাত্র চারমাস কি যথেষ্ট?

আসুন মৃত্যুকে দেখি। কবরস্থানে।

মৃত্যুর পর পয়লা ঘর হলো কবর।

সেখান থকে হাশরের দিন ওঠানো হবে বিচারের জন্যে।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'হে মানুষ! আমি তোমাদের শরীরকে মাটি দিয়ে তৈরি করেছি। ফের সেই মাটির মাঝে নিয়ে যাবো। আবার ওখান থেকে ওঠাবো হাশরের মাঠে।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'হে আমার উম্মত! আমি যা জানি যদি তা তোমরা জানতে তাহলে কম হাসতে বেশি কাঁদতে!'

একসময় লাহোর শহরের একটা কবরস্থানে আশ্চর্য একটা ঘটনা হলো। একটা কবর ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল। সশব্দে। ফাঁক হওয়া কবরটি একজন মহিলার। মহামহিম আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের আশ্চর্য ক্ষমতার প্রকাশ! লাশটির কাফন পুরোপুরি নতুন। এক ফোঁটা ময়লা, মাটির দাগ নেই। অথচ কবরটি অনেক দিনের পুরনো।

মহিলার স্বামী এলেন খবর পেয়ে।

তার অনুমতি নিয়ে কাফনের কাপড়ের মুখের দিকে খোলা হলো। আশ্চর্য! কোনো পচনের চিহ্ন নেই। তাজা! আলোকিত চেহারা।

সবাই স্বামীকে চেপে ধরলেন। 'আমাদের শোনান এই পবিত্রা মহিলার জীবন কাহিনী। কী পূণ্যের কাজ করে এতো বড় উঁচু মর্যাদা হাসিল করলেন?'

লোকটি চুপ করে রইলো। মাথা নিচু। খানিক পর মাথা ওঠালো। তার চোখ অশ্রু ভেজা। সে কান্নাভরা স্বরে বলল, 'আমার স্ত্রী ছিল একজন বেশ্যা। আল্লাহ তায়ালার কী ইচ্ছা। আমার সাথে তার পরিচয়। তার কতগুলো বিশেষ গুণ দেখে আমি মুগ্ধ হই। আমাদের পরিচয় প্রণয়ে গড়ালো। তারপর অনেক সামাজিক বাধা বিপদ টপকে একদিন তাকে বিয়ে করলাম আমি।

তাওবা করলো মেয়েটি।

তাবলিগ জামাতের মেয়েদের তালিম হয় শাহীওয়ালে। ওখানে সে যাওয়া আসা শুরু করলো। দ্বীনি কথা শুনে তীব্র অনুতাপে অস্থির, আকুল আর ব্যাকুল হয়ে পড়লো আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্যে। রোজ বাসায় তালিম করতো ঘন্টা খানেক সময়। সারাদিন সাংসারের কাজের ফাঁকে নামাজ, ইবাদাত, বন্দেগী, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির আজকারে মশগুল থাকতো।

মাঝরাতে সে ধড়মড় করে বিছানা ছাড়তো। বিড়বিড় করতো। 'হায়! কি হবে আমার? আমার কবর আর হাশরের খবর কি? প্রভু কি আমায় ক্ষমা করবেন?'

তার কথা শুনে আমার চোখে পানি চলে আসতো।

সে ভোর পর্যন্ত নামাজ, কুরআন আর দোয়ায় মশগুল থাকতো।

দু'আতে সে বলতো, 'হে পরম করুণাময়, সবাইকে মাফ করো। ক্ষমা করো। বিশেষ করে আমি যে পাপে লিপ্ত ছিলাম তাদের তাওবা নসীব করো। তাদের ক্ষমা করো।'

সে চিৎকার করে কাঁদতো দোয়ার মাঝে।

ভোর পর্যন্ত চলতো তার আহাজারি।

আমার চোখ বেয়ে নেমে আসতো পানি।

দিনে রাখতো রোজ। রাতে বন্দেগী।

সে শুকিয়ে গেল। দিনে দিনে।

সে অল্প দিনে মারা গেল।

একবার।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একধারে একটা নতুন কবর দেখে বললেন, 'কার কবর ওটা?'

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এটা হচ্ছে ওই প্রাচীন বুড়ির যিনি সবসময় মসজিদ ঝাড়ু দিতেন।'

'আহা!' দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ করে উঠলেন, 'তার মৃত্যুর খবর আমাকে কেন জানালে না!'

তারপর কবরের দিকে চেয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

সাহাবা রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু অবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা শুধালেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কার সাথে কথা বললেন?'

'ওই বৃদ্ধার সাথে।'

'তিনি কি কথা বললেন?'

'তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বুড়ি মা, তুমি কেমন আছো?" সে বলল 'আমি খুব সুখ, শান্তি, বিলাস আর বৈভবের মধ্যে আছি।"

'তিনি আর কি বললেন?'

'তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে বৃদ্ধা, তুমি তো দুনিয়াতে অনেক সাওয়াবের কাজ করেছো। মহান স্রষ্টা তোমার কোন পূর্ণ কর্মটিতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন?" সে বলল, 'আমি যে মসজিদ ঝাড়ু দিতাম। সেটা।"

একদিন।

আকা ই নামদার তাজিদারে মাদিনা দুই দুনিয়ার বাদশাহ্ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে গেলেন। অনেকগুলো কবর দেখলেন। খুশি হলেন। শেষমেষ একটা কবরের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর চেহারা মুবারাকে ঘাম দেখা দিল। অস্থির হয়ে পড়লেন। দুশ্চিন্তায় চেহারা কালো হয়ে উঠলো। হয়রান পেরেশান হয়ে গেলেন তিনি।

একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি এমন অস্থির হলেন কেন?

'হায়, হায়!' তিনি অস্থির হয়ে বললেন, 'এই কবরের বাসিন্দার ওপর ভয়ানক আজাব হচ্ছে। এমনই শাস্তি যা ভাষায় বলা যায় না। আহা! এই ব্যক্তির কী উপায়?'

বলে তিনি কবরে তাঁর বুক মুবারাক রেখে দোয়া করলেন। কিন্তু চেহারায় প্রশান্তি এলো না।

তিনি বললেন, 'দোয়া কবুল হচ্ছে না। কোনো রহস্যময় কারণে। সাংঘাতিক বড় পাপ করেছে সে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্থিরতা বেড়েই চললো। তিনি বললেন, 'আমার উম্মতের ওপর এমন কঠিন শাস্তি হচ্ছে আর আমি বাড়ি গিয়ে ঘুমাবো?'

তিনি একজন সাথীকে ডেকে বললেন, 'যাও, মদিনার বাজারে। সেখানে আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে ডাকো যাদের আত্মীয়ের কবর এখানে রয়েছে।'

তারা এলো।

তাদেরকে নিজ আত্মীয়ের কবরে দাঁড়াতে বললেন।

সবাই দাঁড়ালো।

কিন্তু আশ্চর্য! ওই কবরের পাশে কেউ দাঁড়ালো না।

বেদনায় নীল হয়ে গেলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অনেক পরে এলো এক বুড়ি। ধীরে পায়ে। লাঠিতে ভর দিয়ে। তিনি দাঁড়ালেন এই কবরের পাশে।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কার কবর?'

'আমার ছেলের।' বৃদ্ধা বললেন।

'আপনার ছেলের কবরে ভয়ানক শাস্তি হচ্ছে!'

'ইয়া রাসুলুল্লাহ, এটা কি সত্যি?'

'সত্যিই।'

'শুনে আমি খুব খুশি হলাম।'

'আল্লাহ মাফ করুন! এ আপনি কী বলছেন, মা?! সে আপনার সন্তান!'

'শুনুন তাহলে, হে আল্লাহ রাসুল! এই বাচ্চা যখন আমার পেটে তখন তার বাবা মারা যায়। সে পৃথিবীর মুখ দেখলো। তার কেউ ছিল না। আমি নিদারুণ কষ্ট করে তাকে বড় করে তুললাম। তিল তিল করে। সে বিয়ে করলো। স্ত্রীকে পেয়ে ছেলে ভুলে গেল আমাকে। একদিন তার ভালোবাসার বউ কানে কানে কি যেন বলল। ছেলে রাগে অধীর হয়ে মারতে শুরু করলো আমাকে। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলাম আমি। জ্ঞান হারালাম।

হুঁশ ফিরলে আমি প্রার্থনা করলাম। প্রভুর দরবারে। দু'হাত তুলে। বললাম, "হে আল্লাহ, তাকে কবরে শাস্তি দিও। অনন্ত কাল ধরে। দুনিয়াতে দিও না। চোখের সামনে ছেলের কষ্ট সহ্য করতে পারবো না।"

হে আল্লাহর রাসুল! আমি এখন এজন্যে খুশি যে আমার দোয়া কবুল হয়েছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যাচারিতা সরল প্রাণ এই বৃদ্ধার কথা শুনে চোখের পানি চেপে রাখতে পারলেন না। তাঁর মুক্তার মতো অশ্রু গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

খানিকপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'হে বৃদ্ধা মা, তুমি তোমার ছেলেকে ক্ষমা করো। সে ভয়াবহ শাস্তি পাচ্ছে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্, অন্য কিছু বলুন। ছেলেকে ক্ষমা করবো না আমি।'

নিরুপায় হয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে মুখ তুললেন। কাতর স্বরে বললেন, 'হে আল্লাহ্! এই বৃদ্ধাকে কবরের শাস্তি দেখাও।'

চোখের পলকে ঘটনা ঘটলো।

বৃদ্ধার চোখ বিস্ফারিত হলো। সে প্রাণফাটা চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে গেল।

খানিক পর।

জ্ঞান ফিরলো বৃদ্ধার।

থর থর করে কাঁপছেন তিনি। তীর খাওয়া কবুতরের মতো।

তিনি বললেন, 'ওগো খোদা! কবরের আজাব কি এমন ভীষণ! এমন ভয়ানক! ছেলের পুরো শরীর থেকে চামড়া উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তাকে মুগুর পেটা করা হচ্ছে। হে আল্লাহর রাসুল আমি তাকে ক্ষমা করলাম আপনি দোয়া করেন। যেন আমার ছেলে মুক্তি পায়।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ওঠালেন।

দোয়া শেষ।

তাঁর চেহারা উজ্জল।

প্রকৃতিতে, আকাশে, বাতাসে নেমে এলো সুমহান সমাহিত পরিবেশ।

গভীর প্রশান্তি। দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারাকে।

চারদিকে শান্তির ছায়া।



তিন

মৃত্যু।

মানুষ মরেছে। মরছে। মরবে।

প্রাণী মাত্রই মরবে।

প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই হলো টিকে থাকার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম করা। সব প্রাণীই মৃত্যুর মুখোমুখি হলে সব শক্তি এক করে রুখে দাঁড়ায়। আত্মরক্ষার সংগ্রামই হলো সবচেয়ে বড় লড়াই।

মৃত্যুই হলো জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগ।

মৃত্যুকে সেজন্যে সবার এতো ভয়। সব হারাবার ভয়। হারিয়ে যাবার ভয়।

মৃত্যু নিয়ে সভ্যতার আদিযুগ থেকেই সব দেশের, সব ধর্মের মানুষ অনেক চিন্তা করেছে। এসব চিন্তা বেশি ভাগই গড়ে উঠেছে অসার আর অলীক কল্পনার ওপর ভিত্তি করে। বিগত শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বিজ্ঞানে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক উল্টো পাল্টা কথা বলা হয়েছে। যার জন্যে সাধারণের মনে মৃত্যুর ব্যাপারে আজো কোনো সঠিক ধারণা দানা বেঁধে ওঠেনি। বহু ভুল, ভ্রান্তি, অন্ধবিশ্বাস, হৃদয়াবেগ আর সংস্কারে ভরে আছে আমাদের মন।

ইদানিং আমেরিকায় বেশ কয়েকটা বড় বড় কোম্পানী লাখ লাখ ডলার রোজগার করছে। মূলধন হচ্ছে মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়ার মতলব। এসব কোম্পানীর নাম হলো 'ক্রায়োনিকস'।

তারা নানা রকম সচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ (নিজেদেরই লেখা বা তাগিদ দিয়ে লেখানো) দেখিয়ে ধনী বুড়োদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের

মধ্যেই মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার কৌশল আবিষ্কার হয়ে যাবে। কাজেই তাদের মক্কেলেরা এখন যদি কিছু টাকা দেন তাহলে মৃত্যুর খানিক পরেই তাদের মরদেহ নিয়ে এসে ঠান্ডা গুদামে একটা আলাদা বায়ুছাড়া রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রেখে দেবেন। পঞ্চাশ থেকে একশো বছর ধরে তারা সেই মৃতদেহ সযত্নে রক্ষা করবেন। তারপর মরা মানুষ বাঁচিয়ে তোলার কৌশল আবিষ্কার হলেই তারা তাদের মক্কেলদের বাঁচিয়ে তোলার ব্যবস্থা করবেন। মক্কেলরা তখন ফের নতুন করে দুনিয়াকে উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

হায় আহাম্মক!

সভ্যতা, দ্বীন হীনতা তোমাদের মূর্খতার চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে গেছে।

ধিক, তোমাদের চিন্তাধারা।

ধিক, তোমাদের সভ্যতা!

মরার পর বেঁচে ওঠার এই অপূর্ব সুযোগ সংগ্রহে আগ্রহী মক্কেলদের ভিড় নাকি দিনে দিনে বাড়ছে।

একটি অবাস্তব আর উন্নাসিক পদক্ষেপ।

অনেক দিক দিয়েই। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তো বটেই।

আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে বলা যায় মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের মস্তিষ্কের কোষগুলির একটা স্থায়ী পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নিই পঞ্চাশ বছর পর ঐ সব মৃতদেহ আবার বেঁচে উঠবে সেক্ষেত্রে তাদের নষ্ট আর বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়েই বেঁচে উঠতে হবে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো!

ওরকম বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার আগ্রহ কার হবে?

মানবিক কারণেও মৃত্যুহীন জীবন আমাদের কারো কাম্য নয়। খৃস্টপূর্ব তিন শো নিরানব্বই সালে সক্রেটিস বলেছিলেন 'মৃত্যুই জ্ঞানী মানুষের শেষ কাম্য বস্তু'।

বার্ণার্ড শ' লিখেছেন, 'মৃত্যুহীন জীবনের একঘেয়েমি বড়ই ভয়াবহ।'

আমি নিজে দেখেছি অনেক পরহেজগার বৃদ্ধকে তাঁরা সকল জীবনের প্রান্তে এসে মৃত্যুর জন্যে শান্ত ও নির্লিপ্ত চিত্তে অপেক্ষা করছেন। তাদের দর্শন হচ্ছে অনেক তো দেখলাম। অনেক তো পেলাম। আর কেন?

অনেকে মৃত্যুর আকর্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করেন।

এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'মানুষ বেঁচে থাকাকে প্রিয় মনে করে; আসলে মৃত্যু তার জন্যে অনেক ভালো ছিল।' (বায়হাকী)

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মৃত্যু প্রত্যেক মুমিনের জন্যে হাদিয়া বা তোহফা।' (মিশকাত)

তিনি আরো বলেন, 'মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে। আসলে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মৃত্যুই তার জন্যে শ্রেষ্ঠ। যত শীঘ্রি মৃত্যু হবে তত তাড়াতাড়ি সে মুক্ত হলো।' (আহমাদ)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুনিয়া থেকে চলে যাবার উপমা হলো এমন যেন শিশু মায়ের পেট (আঁধার আর ছোট) থেকে বের হয়ে সুবিশাল শান্তির দুনিয়ায় এসে পড়লো।' (হাকিম তিরমিজি)

মৃত্যুর ব্যাপারে মুমিনের কোনো ভয় নেই। আসল কথা হচ্ছে পূণ্যবান হতে হবে। আল্লাহ তায়ালার সাথে গভীর সম্পর্ক করতে হবে।

একদিন।

এক পথিক তাড়াহুড়ো করে কোথাও যাচ্ছে। তার ব্যস্ততা দেখে হযরত আবু হুরাঈরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে ডাকলেন। সে থামলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ভাই, কোথায় যাচ্ছো?'

সে বলল, 'বাজারে।'

আবু হুরাঈরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'ভাই, পারলে আমার জন্যে মৃত্যু কিনে এনো।'

হযরত খালিদ ইবনি মাদান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলতেন, 'এমন যদি হতো যে কেউ বলছে, ওই জিনিষটি ছুঁতে পারলে সে মরে যাবে। তাহলে আমার চেয়ে আগে কেউ ছুঁতে পারতো না।' (শারহুস্ সুদুর)

প্রিয়জনের সাথে মিলিত হবার তীব্র বাসনায় মৃত্যুর জন্যে অনেকে আকুল হন।

শুধু মানুষ নয় নানান জীব জানোয়ার, হাতি, বুনো মোষ, সিংহ, বানর যারা যৌবনে দল বেঁধে বাস করে। একদিন বুড়ো হয়। তখন দল ছুট হয়ে আমৃত্যু অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়ায়।

সব প্রাণীই মৃত্যুর সাথে লড়াই করার ইচ্ছে সারাজীবন ধরে রাখে না।

জীবনের মতো মৃত্যুর একটা সঠিক সংজ্ঞা বের করা কঠিন কাজ। শিশু যখন মায়ের পেটে ভ্রুণ হয়ে আসে তখনি সে মৃত্যুর সংকেত বুঝে নেয়।

মায়ের পেটে শিশুর কতগুলো কোষ নিয়মিত ভাবে মরে যায়। ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের দেহের শতকরা এক থেকে দেড় ভাগ কোষ প্রতিদিনই মৃত্যু মুখে পতিত

হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু সংকেত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে না। যখন পড়ে তখন দেহের মৃত্যু ঘটে। আমাদের চোখের সামনেই প্রতিদিন গাছের পাতা ঝরছে। ফুল শুকোচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু হচ্ছে না গাছটির।

আবার পাকার পর সারা মাঠের শস্য কয়েকদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যায়। তখন হাজার চেষ্টা করলেও তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

মৃত্যুর এই বিচিত্র ইশারার প্রকৃত কারণ আজও স্পষ্ট কিছু জানা যায় না।

মৃত্যুর ইশারার মতো আরেকটা বহু বিতর্কিত বিষয় হলো মৃত্যুর সংজ্ঞা আর তার সময় বের করা।

মৃত্যু কাকে বলে?

মৃত্যু কখন ঘটলো?

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া। দেহের তাপ কমে যাওয়া। দেহ শক্ত হয়ে যাওয়া। এটাই কি মৃত্যু?

এগুলো অবশ্যই মৃত্যু নয়। মৃত্যুর লক্ষণ। তাছাড়া এগুলো ঘটতে দেখা গেলেও যে একটা মানুষের মৃত্যু হয়েছে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ ওইসব দেখা দেবার পরও মানুষকে আবার বেঁচে উঠতে দেখা গেছে।

জগদ্বিখ্যাত লেখক জি এইচ, মুড়ি তার অদ্ভুত গবেষণা গ্রন্থ "লাইফ আফটার লাইফ" বইয়ে এমন সব চল্লিশ জন রোগীকে খুঁজে বের করেছেন যাদেরকে চিকিৎসক ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্য!

কী এক অলৌকিক কারণে ফের তারা বেঁচে উঠেছেন। সুস্থ জীবন যাপন করেছেন। সংসার পাতি করেছেন।

আর তাদের জীবনে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন।

তারা আখিরাতকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

ওই চল্লিশজন রোগীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন মুডি (Moody)। তারা বলছেন, 'অপূর্ব, অবিশ্বাস এক জগতে বিচরণ করছিলাম আমি। অনাবিল সুখ আর শান্তির অনুভব নিয়ে এ বাগান ও বাগান ভ্রমণ করেছি।'

অন্য কেউ বলছেন, 'ভয়াবহ এক পৃথিবী। সীমাহীন যন্ত্রণা আর অবর্ণনীয় অপমান ঘিরে ফেললো আমাকে।'

মুডি মোটামুটি এই দু'ধরনের কথা শোনেন।

তিনি তাদের পাড়া পড়শি, অফিস কলিগ, বন্ধু বান্ধব এদের কাছে গেলেন। তাদের সম্পর্কে মতামত নিলেন।

তিনি অবাক হলেন তাদের মন্তব্য মুনে।

যে লোকটি বললো সুখী ছিলাম, শান্তিতে ছিলাম তার সম্পর্কে সবাই বলছে 'এই মানুষটি সোনার টুকরো'। 'খুব ভালো লোক'। 'অমন মানুষই হয় না'।

আর যে কষ্ট আর যন্ত্রণার মাঝে ছিল তার সম্পর্কে একে একে সবাই খারাপ মন্তব্য করছে

যাই হোক, মৃত্যু লক্ষণ মৃত্যু নয়।

মৃত্যুর অপরিবর্তনীয় ক্রিয়া মস্তিষ্কের কোষগুলোতেই প্রথম শুরু হয়। তবুও (EEG & Electro Encephalgram) পরীক্ষায় যার মস্তিষ্কের কোষগুলো Flat বা তরঙ্গ শূন্য অর্থাৎ মৃত বলে ধরা পড়েছে এমন রোগীকেও ফের চাঙ্গা হয়ে উঠতে দেখা গেছে।

মৃত্যুর বাহ্যিক লক্ষণ দেহের সর্বত্র ফুটে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে কমপক্ষে আরো আট ঘন্টা মৃত ব্যক্তির পেশীগুলো বৈদ্যুতিক শকে উত্তেজিত হয়ে থাকে। মত্ ব্যাঙের পেমি নিয়ে পরীক্ষাগুলো এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর সময় দেহের অসংখ্য কোষের স্বাভাবিক জীবন ক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একসাথে যায় না। ধীরে ধীরে থামে। ব্রেক কষার ভঙ্গিতে।

একটা কোষের তখনই মৃত্যু ঘটেছে বলা যাবে যখন তার সাইটো প্লাজমের স্বাভাবিক গতিবিধি বন্ধ হয়ে যায়।

তখন তার physical browning movement শুরু হয়। কিন্তু সব কোষে সেটা ঘটতে সময় লাগে। যতক্ষণ দেহে একটি কোষ ও জীবিত আছে ততক্ষণ জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। সেই জীবন একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। মৃত্যু আসে ধীরে ধীরে। ধাপে ধাপে। এক মুহূর্তেই সব শেষ হয় না।

একমাত্র বিস্ফোর জনিত দুর্ঘটনায় যেখানে নিমেষের মধ্যে সম্পূর্ণ দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে কিমার মতো হয়ে যায় সেখানেই ঘড়ি ধরে সঠিক মৃত্যু সময়টি বলে দেয়া যায়।

কাজেই সত্যিই কি মুত্যুর কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে? কিছুদিন আগে একটা ভাষণে আমি বলেছিলাম 'মৃত্যুই জীবনের আধার জীবনের পূর্ণতা, জীবনের নতুন সংস্করণ।' এক সাথী ভাই শুনে বললেন, এটা দর্শনের কথা। বিজ্ঞানের বা যুক্তির নয়।'

আমি কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তি অনুসরণ করেই কথাটি বলেছিলাম।

একটা উপমা দিচ্ছি।

মানুষের দেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে তৈরি। এই কোষের এক থেকে দেড়ভাগ স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিদিনই মারা যাচ্ছে। এই মত্যু যদি কোনো বৈজ্ঞানিক কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হয়। তাহলে আমাদের দেহের ওজন প্রতি আশি দিন অন্তর অন্তর দ্বিগুণ হতে থাকবে। এক মণ ওজনের মানুষ এবাবে এক বছর পর বারো মনী মানুষে পরিণত হবেন। দু'বছর পর এক শো চুয়াল্লিশ মণ। তিনি বছর পর এক হাজার সাতশো উনিশ মণে। চার বছর পর কুড়ি হাজার সাত শো চত্রিশ মণ হবে। এমনি করে মানুষটির আয়ু যদি সত্তর বছর হয় তাহলে শেষমেষ তার ওজন আর উচ্চতা দুনিয়ার সবচেয়ে উচুঁ বাড়ি শিকাগো সিটির অ্যাম্পায়ার স্টেকে ছাড়িয়ে যাবে।

বুঝুন অবস্থাটা!

কাজেই মত্যুর হিরন্ময় ছোঁয়া না থাকলে দুনিয়ার যাবতীয় প্রাণীর রূপ আর বৈশিষ্ট হারিয়ে যাবে।

একটা মশা হবে তালগাছের মতো

একটা হাতী হবে বড় পর্বতের মতো।

অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকাই মুশকিল হবে।

এক অনাসৃষ্টির পৃথিবী!

দেহকোসের নিয়মিত মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেলে দেহের ভয়ঙ্কর বিকৃতি ঘটবে। ঠিক তেমনি মানুষের মৃত্যু বন্ধ হলে জনসংখ্যার একই দৃশ্য হবে। এটা লক্ষল করার বিষয়, যে হারে আমাদের দেহকোষের মৃত্যু গটছে ঠিক সেই হারেই ফি বছর পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়েছে। এই অবস্থা আরো কয়েক হাজার বছর চলতে থাকলে মানুষের মোট ওজন পৃথিবীর বর্তমান ওজনকেও ছাড়িয়ে যাবে। একটা এক হাজার চারশো একাত্তর ফুট উচুঁ অ্যাম্পার স্টেট বিল্ডিংকে দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরের মধ্যে রাখার কল্পনা করা যায় না। টিক তেমনি ওই বিপুল মানবজাতির সংকুলান পৃথিবীর বুকে হবে না।

মৃত্যু সুদক্ষ মালীর মতো জীবনের অতিরিক্ত বাড় নিয়ত ছাটায় করে। তার একটা নির্দিষ্ট রূপ, আকৃতি ও সংখ্যায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। মৃত্যুর হাতে অমৃত পান করেই জীবন আজও টিক আছে পৃথিবীতে।

তারপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

জীবনের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হচ্ছে বলেই ধ্বংসের এই প্রয়োজনীয়তা। জীবনের বৃদ্ধিকে ঙদি বন্ধ করতে পারি তাহলে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েও তো আমরা অমরত্ব লাভ করতে পার? কিন্তু সব জীবন যদি একটা স্থির বিন্দুতে এসে অনন্তকাল ধরে চিরতারুণ্য উপভোগ করতে থাকে তাহলে মহান, মহামহিম, পরাক্রান্ত আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে। থেকে যাবে ভাঙা-গড়ার খেলা।

অজস্র জন্ম আর অজস্র মৃত্যুর মাঝ দিয়েই জীবন ক্রমিবিকামের স্রোত বয়ে চলেছে। অপ্রতিহত গতিতে। মৃত্যু ছিল বলে, মৃত্যু আছে তাই নতুন রূপে উত্তরণ ঘটছে জীবনের। ক্রমবিকামের স্রোত যদি বন্ধ হয়ে যায়, জীবন সংস্কারের সম্ভাবনাও মুছে যাবে। বিনষ্ট হবে। জীবনের মূল বৈশিষ্ট।

এটা কখনো কাম্য হতে পারে না জীবনের।

পৃথিবীর বেশির বাগ মানুষই মৃত্যুর ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন না।

আধুনিক যুগে মৃত্যুকে পুনর্বিচার করে যারা উপযুক্ত মূল্য দিতে চান তাদের বলা হয় অর্থোথানসিয়ান (Orthothansian)। লাইফ সায়েন্স বা জীবন বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান বিষয়ই হওয়া উচিত মৃত্যু। জীবনের পটভূমিতে মৃত্যুর এই মহান ভূমিকা যাচাই করে দেখা। মৃত্যু জীবন ক্রিয়ারই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দর্শনে একটা শাশ্বত সুন্দর কথা আছে। 'সব কিছু ঘুরছে। চক্রের আকারে'। পদার্থের পারমাণবিক গঠন থেকে শুরু করে মহাকাশের সৌরমণ্ডল, তারকারাজি

আর নীহারিকা পুঞ্জের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একথা যেমন সত্য তেমনি আমাদের জীবনের প্রতিটি মূল ক্রিয়াই চক্রের আকারে আবর্তিত হচ্ছে।

বীজ থেকে জীবন অঙ্কুরোদগমের মাঝ দিয়ে ফলে ফুলে পরিণত বৃক্ষে বিকশিত হয়ে উঠছে। ফের ফিরে আসছে। মাটি থেকে বৃক্ষ যত সার পদার্থ শেকড়ের মাঝে দিয়ে টেনে নেয়। মৃত্যুর পর দেহের পচনের মধ্য দিয়ে তার সবই ফিরিয়ে দেয় মাটিতেই। জীবনের শ্বাসক্রিয়া, অঙ্গার আত্মীকরণ, রক্ত সঞ্চালন, জীবানু ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে নির্ভরতা সবই এক সুশৃঙ্খল চক্রের আকারে কাজ করছে। তাছাড়া পৃথিবীর জল, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার, বাষ্প যাবতীয় খনিজ দ্রব্য সবই চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। বার বার।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষ বারবার এই সব চক্রের নানান সুরক্ষিত স্থানে হাত দিয়েছে। তাতে নষ্ট হয়েছে প্রাণের স্বাভাবিক গতি আর শৃঙ্খলা। এগুলো করা হয়েছে বিজ্ঞানের নামে। কিন্তু আগামী পৃথিবীর মানুষের কাছে তা চিহ্নিত হবে অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ হিসেবে।

মৃত্যু আসবে।

অমোঘ নিয়তির কাছে মানতেই হবে হার।

কেউ ঠেকাতে পারবে না তার অপরাজেয় শক্তিকে। ঠিক মুহূর্তটিকে পৃথিবীর দুর্গম দুর্গে এসে নিয়ে যাবে প্রাণ।

পালাবে কোথায়? মৃত্যুর হাত থেকে?

মৃত্যু এক ভয়ানক পরিণতি। তার হামলা অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু মানুষ তার থেকে একেবারে উদাসীন। নানান কাজ কর্মের ফাঁদে প্রায় ভুলেই যায় সে মৃত্যুকে। কখনো মনে পড়লেও তা আবছামতো। এতো অন্যমণস্ক ভাবে যে মনে রেখাপাত করে না। শুধু মুখের কথা থেকে যায়।

সেজন্যে মনকে সব রকম দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত করে মৃত্যুর কথা ভাবতে হবে। যেন সে সামনে। একেবারেই সামনে।

তো চিন্তা করেন কিভাবে আপনার আত্মীয়েরা চলে গেছে একে একে। কী করে তাদেরকে ওঠানো হয়েছিল লাশের খাটে। কী করে চাপা দেয়া হয়েছে মাটির নিচে। কতই না সুন্দর ছিল তাদের চেহারা। কতো বেশি সামাজিক মর্যাদা ছিল। মন্ত্রী ছিল, সচিব ছিল, ছিল বিরাট ব্যবসায়ী। ছিল সুবিশাল অট্টালিকা, দিগন্ত জোড়া খামার বাড়ির মালিক।

সুদর্শন সেই সব পুরুষ, সুন্দরী সেই সব নারীর সুন্দর চেহারা পচে গলে চলে গেছে কোথায়? তাদের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে কাদায় মিলে মিশে গেছে।

তারা চলে গেছে। পড়ে আছে তাদের ছেলে মেয়েরা। তারা এতিম।

তারা চলে গেছে। পড়ে আছে তাদের স্ত্রীরা। তারা বিধবা।

এতিম সন্তান, বিধবা স্ত্রী আর অনাথ আত্মীয়রা কাঁদে কিন্তু তাকে আর পায় না। তাদের ঘর-বাড়ি, জিনিষ-পত্র, পোশাক-আশাক সব পড়ে আছে। নেই তারা।

এমন অবস্থা আমারও হবে।

তারা এই দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় এখানে ওখানে আড্ডা দিত। হো হো হা হা শব্দে কথায় কথায় হেসে উঠতো। দুনিয়ার স্বাদে আর মজায় বিভোর থাকতো।

ভুলেও একবার স্মরণ করেনি মৃত্যুকে।

হায়!

আজ দেখো তাদের পরিণতি।

নিঃশব্দে মিশে গেছে মাটিতে

কিভাবে যৌবনের নেশায় মত্ত ছিল।

আজ তারা পাশে নেই কেউ। দিন যায়। সপ্তাহ যায়। মাস যায়। বছর যায়। কেউ একবার জিজ্ঞেসও করে না। কারো মনেই আজ আর সে নেই।

দুনিয়ার ঝামেলায় কতই না ব্যস্ত ছিল।

হাত অবিরাম কাজ করতো। পা অবিশ্রাম চলতো ফিরতো। মাথা খাটাতো। কিভাবে ব্যবসা হবে। কী করে উন্নতি হবে। কেমন করে মর্যাদাবান হবে। বুদ্ধি বের করতো। আসতো টাকা। অঢেল সম্পদ। মন বলতো তোর বুদ্ধিতেই তো এতো উন্নতি।

হায়!

আজ হাত বাহু থেকে আলাদা।

পা বিচ্ছিন্ন ভাবে পড়ে আছে। জিভ খেয়ে ফেলেছে পোকা। সুন্দর ঠোঁট, দাঁত মেলে খিল খিল করে হাসতো।

সেই দাঁত আজ আলাদা হয়ে পড়ে আছে এদিক সেদিক।

কত ধরনের চিন্তা করতো। নিজের বর্তমান সময়ের জন্যে। ভবিষ্যতের জন্যে। ছেলেপুলেদের বর্তমানের জন্যে। ভবিষ্যতের সুখ শান্তি আরাম আয়েশের জন্যে। বাড়ি করতে হবে। গাড়ি কিনতে হবে। হাজার বছরের সুখ শান্তির বিলাসিতার চিন্তা এক মাথায় খেলে যেত।

কিন্তু সে জানতো না আগামীকাল তার মৃত্যু দিবস।

আসমানে ফিরিশতাদের কাছে সারা বছরের কাজের বিবরণ দেয়া হয়। তা শবে বরাত বা শবে কৃদর দুই রাতেই হতে পারে।

কে জন্ম নেবে।

কে কতটুকু রুজি পাবি।

কে কতটুকু মর্যাদা পাবে।

হজ্জ্ব করবে কে?

কে মরবে।

সব ওই রাতে লেখা হয়ে যায়।

একজন বিয়ে করছে অমুক তারিখে।

আসমানে লেখা হয়েছে দু'দিন পর তার মৃত্যু দিবস।

খেলা ধুলায় ব্যস্ত যুবক। বিকেলে। রাতে তার মৃত্যুক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে।

একটা দুর্ঘটনা ঘটলো করাচিতে।

বাস অ্যাক্সিডেন্ট।

চারজন ম্যারা গেল। বেশ ক'জন আহত হলো। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া এক জামাত ছিল ওই সফরে। এক তরুণ বললো হায় আমি যদি মরতাম! শহীদি মর্যাদা পেতাম।

সে কিন্তু মোটেই আহত হয়নি।

কিন্তু আল্লাহতায়ালা জাল্লাজালালুহুর কী শান!

হঠাৎ। তার দম আটকে এলো। মুখ ভরে বমি হলো। রক্তের। নাক দিয়েও বেরিয়ে এলো রক্ত।

কথাটা বলার তিনঘন্টা পর মারা গেল সে।

ডাক্তার বললেন, 'এমন আশ্চর্য ঘটনা আর দেখিনি'।

আল্লাহর রাস্তায় নবীদের মতো দোয়া কবুল হয়। সে শহীদি মৃত্যু চেয়েছিল। আল্লাহ তাকে তা দান করলেন।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, 'শাবান মাসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি রোজা রাখতেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এই মাসে মৃতদের তালিকা তৈরি হয়। আমার অন্তর চায় তালিকায় আমার নাম যখন লেখা হয় তখন আমি যেন রোজাদার থাকি।"

হাদিসে পাকে আছে, 'রোজ ভোরের সময় সূর্য বলে, সাওয়াবের কাজ যা করতে হয় আজই করে নাও। এই দিন আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসবে না।'

একজন মালাইকা আসমান থেকে ঘোষণা করে যে, 'হে নেক কাজের মানুষ! শোনো সুসংবাদ। এগিয়ে যাও। আরেকজন মালাইকা বলে, পাপাচারীরা! থামো! ধ্বংসের জিনিষ আর জমা করো না।'

অন্য দু'জন ফিরিশতার একজন বলে, 'হে প্রতিপালক! যারা ধনসম্পদ তোমার পথে খরচ করে তাদের প্রতিদান দাও।'

অন্য একজন বলে, 'যারা মাল আল্লাহর পথে খরচ করে না তার ধন সম্পদ নষ্ট করে দাও।'

আতা বিন ইয়াসির (রঃ) বলেন, 'শাবানের মাঝখানে আজরাইল আলাইহিস সালামকে এক বছরের মাঝে যারা মারা যাবে তাদের তালিকা দেয়া হয়।

সেখানে এমন লোক রয়েছেন যিনি বিয়ে করেছেন মাত্র। কিংবা সুদৃশ অট্টালিকা তৈরি করা শুরু করেছিলেন সবে। সব ফেলে চলে যেতে হয়েছে তাকে।

যদি সারা জীবন কারো কেউ বিপদ আপদ, দুঃখ-কষ্ট, অপমান-লাঞ্চনা, দুঃশিন্তা আর যন্ত্রণায় একবারও না পড়ে তবু মৃত্যুর সময় আজরাইল আলাইহিস সালামকে দেখলেই সব সুখ আর আনন্দ মুছে যাবে।

মৃত্যু চিন্তা মানুষের সব অলসতা আর সুখ শান্তিকে দূর করে দেয়। মৃত্যু এতো বড় মারাত্মক সমস্যা যে তার তৈরির জন্যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকা উচিত মানুষের।

কোনো মানুষকে একথা বলে দেয়া হয় না যে তুমি ওই বছরের অমুক দিনের ওই ক্ষণে মরবে। তাহলে সে সেই নির্দিষ্ট দিনের এক বছর আগে তাওবা করে নেবে। হজ্জ্ব করবে। তাবলিগে তিন চিল্লা চার মাস লাগাবে। দাড়ি রাখবে। টুপি চড়াবে মাথায়। গোঁফ ছোট করবে। গায়ে দেবে আজানু লম্বিত জুব্বা। মাথায় বিশাল পাগড়ি।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদর্শ খুঁজবে। জানবে। মানবে। খাওয়া হবে দস্তরখানে বসে। আদর্শের যে কোন একটা। দু'হাঁটু মুড়ে, আত্তাহিয়্যাতুর ভঙিমায়, এক হাঁটু মুড়ে। শোয়া হবে নবীজির আদর্শ। ওজুর সাথে। ঘুমের দোয়া পড়ে। বিছানা তিনবার ঝেড়ে। ডানদিকে কাত হয়ে। কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতে করতে।

এভাবে আল্লাহতায়ালার দেয়া যাবতীয় হুকুম, প্রতিটি হুকুম খুঁটিয়ে পালন করবে। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদর্শ মানবে।

এমন সময় সেই নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট ক্ষণ এসে উপস্থিত।

মৃত্যুদূত হাজির।

ঈমানের কালিমা পড়তে পড়তে বিদায়।

কিন্তু না ভাই,

এমন তো কোনো সুযোগ নেই।

আজরাঈল আলাইহিস সালাম কাউকে না বলে, না ইশারা দিয়ে চলে আসে। তখন হয়তো সে বাস যাত্রী। হয়তো সে কোনো নভেল নাটক পড়ায় নিমগ্ন। হয়তো শরাবের বোতল নিয়ে বসে আছে সে। কিংবা কোনো হাউজির আড্ডায়। বা কাউকে খুনের পরিকল্পনা করছে। অপরের জমি দখলের কূট ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। সিনেমা হলের আঁধারে। তাসের আড্ডায়। গাঁজার আসরে। নেশাপানিতে লিপ্ত। বাজে মেয়েদের সাথে। রাজ সিংহাসনে বসে। বিদেশী কূটনীতিকের সাথে আলোচনায়।

এমনি সময় এসে পড়ে। সে।

আজরাইল।

জীবন ঘুড়ির সূতো, লাটাই তো অন্যের হাতে।

জানা নেই কখন টেনে বসে।

লোকমান হাকীম রহমতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ছেলেকে বলছেন 'মৃত্যু এমন ঘটনা যার ভূমিকা সম্পর্কে জানা নেই। কখন এসে পড়বে জানে না কেউ।'

সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে এক মানুষ। চারপাশে তার আনন্দ আর ফূর্তির সামগ্রী। তাতে সে লিপ্ত। এমন সময় খবর পায় পুলিশ খুঁজছে তাকে। গ্রেফতার করবে তাকে। সব আনন্দ মাটি হবে তার। রাত কাটবে অঘুমে।

মৃত্যু তো তেমনি।

আচমকা আসবে।

কেড়ে নেবে জীবনের সব আনন্দ। খুশি।

পুলিশের বেত থেকেও কঠিন সেই মুগুর। যা ফিরিশতা নিয়ে আছে। পাপিষ্ঠকে শাস্তি দেবার জন্যে।

মূর্খ মানুষ। অহঙ্কারী।

ঘাড় উঁচু করে আছে। অমোঘ নিয়তির বিরুদ্ধে। মৃত্যুর মুকাবিলায়। সে জানে না কী বিপুল বিক্রমে ধরা হবে তাকে। আকাশ চিরে নামবে সে। মাটি ফুঁড়ে উঠবে সে। পলকে। ছিনিয়ে নেবে প্রাণ।

শুনুন তাহলে-



চার

ডালাস। টেক্সাস।

বাইশ নভেম্বর। উনিশশো তেষট্টি।

দুপুরের রোদে ঝলমল করছে শহর। টেক্সট বুক ডিপোজিটারির কাছে পৌঁছুতেই ঘটলো ঘটনাটা। গাড়ির গতি ছিল ধীর। অবস্থা যে এ খাতেই বইবে খুনী তা ভালো করেই জানতো। একটা নিগ্রো ছেলে আর একজন প্রেস ফোটোগ্রাফার ওই বাড়ির তেতলার জানালা থেকে রাইফেলের নলের মতো কী বেরিয়ে আসছে লক্ষ করলেন। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা এতো দ্রুত ঘটে গেল যে বিষয়টি আর কারো নজরে আনার সময় পেলেন না।

রক্তাক্ত ঘটনাটা ঘটলো।

সময় মাত্র কুড়ি সেকেন্ড।

কুড়িটি মুহূর্ত।

লুটিয়ে পড়লো প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ।

সে সময় প্রেসিডেন্ট দু'পাশের জনতার উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। গলায় এসে বিঁধলো প্রথম বুলেটটি। কাত হয়ে পড়লেন তিনি। টেক্সাসের গভর্ণর বাঁদিকে ফিরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ! আমাদের সবাইকে খুন করবে!'

চোখের পলকে ছুটে এলো আরেকটি বুলেট। মৃত্যুঘাতক। তার প্রচন্ড ঘায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন কোনালি। পর মুহূর্তে এলো তিন নম্বর বুলেট। আঘাত হানলো প্রেসিডেন্টকে।

একটা কথা বলারও সময় পেলেন না তিনি।

ফিনকি দিয়ে ছুটেছে রক্তের ধারা।

আতঙ্কে পাথর তার স্ত্রীর ভয়ার্ত বোবা কান্না বেরিয়ে এলো 'উহ! একী হলো! --- আমার সর্বনাশ হলো! জ্যাক --- জ্যাক ---'

স্বামীর দেহ জড়িয়ে ধরলেন তিনি আছড়ে পড়ে।

সময়টা গোড়া থেকেই ভালো যাচ্ছিল না এসময়ের পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত নৃপতির। জনাব জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম রোধ, পরমানু-বোমা পরীক্ষা করার সীমিত ব্যবস্থা, অনুন্নত দেশগুলোর অগ্রগতির জন্যে পরিকল্পনা, রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, বিশ্ব শান্তির জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়া যাওয়া ছাড়াও রয়েছে নিজ ঘরের সমস্যা। আর তার সবচেয়ে বড় দিক হলো শাদা-কালোর দ্বন্দ্বের ওপর পর্দা টানা।

'মুক্তি ঘোষণাপত্র' কে কার্যকরী করার জন্যে যে আপ্রাণ চেষ্টা আমেরিকার দু'কোটি নিগ্রো চালিয়ে যাচ্ছিল, একজন সৎ মানুষ হিসেবে তাঁর বরাবরই সহানুভূতি ছিল এতে। রিপাবলিকান আব্রাহাম লিংকন নিগ্রোদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আগেই বর্ণ-বিদ্বেষীর গুলিতে নিহত হন। কেনেডি শুধু মুখেই নয়, কাজেও প্রমাণ করছিলেন তিনি নিগ্রোদের সম-অধিকার দাবির একজন প্রবল সমর্থক। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার ক'দিন আগে আটক নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিংকে জামিনে ছাড়িয়ে আনেন তিনি।

হোয়াইট হাউসে আসার পরই কেনেডি বুঝলেন, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফেলতে হবে পা। তাড়াহুড়ো করলে যাঁদের সহানুভূতি তাঁর উপর আছে, তারাও বিমুখ হয়ে পড়তে পারে। তিনি জানতেন যে করেই হোক দক্ষিণ অঞ্চলের ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন তাকে পেতেই হবে। তাই তাঁর প্রথম দিকের বক্তৃতায়, বিশেষতঃ 'স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে,' তাঁর মনোভাবের উগ্র প্রকাশ ঘটেনি।

দিন গড়িয়ে চললো। কেনেডি স্থির নিশ্চিত হলেন নিগ্রোরা যদি রাজ্য আর স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে অংশ গ্রহণের অধিকার পায় তাহলে রাজনৈতিক পান্ডারা তাদের দাবি অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। সে পথ ধরেই এগোলেন তিনি।

দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে তখন কতগুলো অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিলো। স্টেশন, এয়ারপোর্ট, বাস, সিনেমা, হোটেল ইত্যাদিতে 'কালো' বলে নিগ্রোদের ঢুকতে দেয়া হতো না। স্কুল-কলেজও ছিল আলাদা। অথচ খেলাধুলা থেকে শুরু করে কলকারখানার দিনমজুর পর্যন্ত, বহুকাজে এদের ব্যবহার করছে শাদারা। মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালো নিগ্রোরা। শুরু হলো দাঙ্গা।

বিচলিত হলেন কেনেডি।

জাতির উদ্দেশে টেলিভিশন বক্তৃতায় বললেন, 'প্রেসিডেন্ট লিংকন ক্রীতদাসদের একশো বছর আগে মুক্তি দিয়েছেন। তবু মার্কিন নিগ্রোরা আজও মুক্তি পায়নি। --- অত্যাচার আজ তাদের পিছু ছাড়েনি। এরই ফলে উত্তর আর দক্ষিণের প্রতিটি শহর জ্বলছে। প্রত্যেক স্তরে অনাচার দূর করতে আইন চাই। তবে আইন মানুষকে সবকিছু শেখাতে পারে না। দমন নীতিও এর সমাধান নয়। বিক্ষোভ আর শোভাযাত্রার হাতেও এর সমাধান ছেড়ে দেয়া যায় না। এখন প্রতিটি রাজ্যে, আইনসভায়, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনেও আমাদের এ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।'

এই বক্তৃতাকে মানবতাবাদীরা স্বাগত জানালেও, ঘাতকের অস্ত্রে শান দেয়ার কাজ শুরু হলে সেদিন থেকেই। সেই ভাষণের মাত্র ক'ঘন্টা পরই নিগ্রো নেতা মেডগার এভার্স গুলিতে প্রাণ হারান।

দেশের দুশো আশিজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠালেন কেনেডি। তাদের অনুরোধ জানালেন, যাতে দেশের সমস্ত ইউনিয়ন থেকে বর্ণবৈষম্য দূর হয়। অনুরোধ রক্ষা করা না হলে তিনি নিশ্চয়ই শক্ত হবেন। এবার দক্ষিণের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গুলোকে অপসারিত করলেন। শাদাদের জন্যে বিশেষ ভাবে আর কিছু নির্দিষ্ট রইলো না। কালোরা যে কোনো হোটেল বা ক্লাবে যেতে পারবে। উঠতে পারবে ট্রেনের যে কোনো কামরায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ওই একই ব্যবস্থা।

দক্ষিণের সব স্টেট এই আদেশ মাথা পেতে নিল না। তাদের মনে হলো প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্তে পৌছেছেন। বিষয়টা আগুনের রূপ নিলো জেমস মেরিডিথকে নিয়ে।

এই নিগ্রো ছাত্রটা নতুন ব্যবস্থা অনুসারে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গিয়েছিল। বিতাড়িত হলো সে। ঘটনা থামলো না এখানেই। শুরু হয়ে গেলো কালো ঠেঙানো। বিস্ময়ের ব্যাপার ওই স্টেটের গভর্ণর কেন্দ্রীয় আদেশ অমান্য করে শাদাদের হিংস্রতায় ইন্ধন দিলেন।

কেনেডি নিরব দর্শকের ভূমিকা নিতে পারলেন না। প্রথমে তিনি মিসিসিপি স্টেটকে সতর্ক করলেন। তাতে যখন কাজ হলো না, ষোলো হাজার ফেডারেল সৈন্যকে মার্চ করিয়ে দিলেন। ওখানকার গভর্ণর আর কিছু করতে সাহস পেল না। সৈন্যরা সবকিছু কঠোর হাতে দমন করলেন। নিগ্রো ছাত্র জেমস মেরিডিথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শুরু করলো শাদাদের পাশে।

নভেম্বর। উনিশশো তেষট্টি।

কেনেডি শাসনামলের চৌত্রিশ মাস।

এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করলেন প্রেসিডেন্ট। আসছে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ডেমোক্র্যাটিক দল নিঃসন্দেহে তাঁকেই মনোনয়ন দেবে। তবে ফের যাতে জয়লাভ করতে পারেন সেজন্যে সচেষ্ট হতে হবে তাঁকে।

কাজেই দক্ষিণে যাওয়া দরকার।

প্রথমে টেক্সাসে যাওয়াই স্থির করলেন তিনি।

স্পেন, ফ্রান্স ও মেক্সিকোর অধীনে থাকার পর টেক্সাস প্রজাতন্ত্রী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারপর এখানকার জনগণের রায় অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা টেক্সাস আমেরিকার অর্ধেক পেট্রোল আর গ্যাস উৎপাদন করে।

এখানকার শাদা চামড়ার লোকেরা কালোদের চাবুকপেটা করতেই অভ্যস্ত। দিনকাল পাল্টালেও এদের মনের গতি বদলায়নি একটুও। বর্ণদাঙ্গা লেগেই আছে এখানে।

অক্টোবর মাসেই টেক্সাসে খবর পৌঁছে গিয়েছিলো প্রেসিডেন্ট সফরে আসছেন। গভর্ণর কোনালি দোটানায় পড়ে গেল।

কালোদের সে পছন্দ করে না। এখানে এসে কেনেডি তাদের হয়ে ওকালতি শুরু করলে বিশ্রি ব্যাপারে হবে। ওদিকে আসছে নির্বাচনে কেনেডির সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যারি গোল্ডওয়াটারের বাড়ি এখানেই। টেক্সাসে তার প্রভাব অপরিসীম।

বেশ চিন্তায় পড়ে গেল কোনালি।

ওয়াশিংটন থেকে ডাক পড়লো তার। যাবার আগে ডালাসের প্রভাবশালী লোকদের নিয়ে এক বৈঠক করলেন তিনি।

বৈঠকে উপস্থিত হলো চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, ব্যাংকার, সংবাদপত্রের মালিকদের মতো ব্যক্তিরা। কারো ইচ্ছে নয় কেনেডি টেক্সাসে আসুন।

'এ ব্যাপারে আমি পুরোপুরি নিরুপায়,' বলল কোনালি, 'তবে এই সফরকে অন্যভাবেও কাজে লাগানো যেতে পারে।'

সফরের কয়েকদিন আগে ডালাসে পৌঁছুলেন জেরিবুনো। তাঁকে পাঠানো হয়েছে, কি রকম ব্যবস্থাপনা হচ্ছে তা দেখার জন্যে। তিনি দেখলেন অন্যান্য ব্যবস্থা মোটামুটি হলেও প্রেসিডেন্ট কোথায় ভাষণ দেবেন তা তখনো ঠিক হয়নি। তিনটে জায়গা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে, উইমেন্স বিল্ডিং, মার্কেট হল আর টেডমার্ট। জেরি দেখে শুনে উইমেন্স বিল্ডিং-এর পক্ষে রায় দিলেন। কোনালি নানা অজুহাত দেখিয়ে তা কেঁচে দিল।

শেষ পর্যন্ত টেডমার্টে ব্যবস্থা হলো বক্তৃতার।

মারাত্মক সুবিধে হলো খুনীর।

বৃহস্পতিবার।

বাইশ নভেম্বর। উনিশশো তেষট্টি।

ডালাসে যাবার তৈরি শেষ।

হোয়াইট হাউস থেকে বেরুবার সময় হয়ে এলো।

দ্রুত চিন্তা করে নিলেন কেনেডি। ওখানে তার আর কিছু বলার আছে কিনা। নেই। ডালাসে যে ভাষণ দেবেন তার টাইপ করা কপি সাথেই রয়েছে। দীর্ঘ ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলবেন, 'আজকের পৃথিবীতে স্বাধীনতা বাতিল হয়ে যেতে পারে একটিও গুলি না ছুঁড়ে!'

থম থম করছে ডালাস।

কয়েক হাজার ইস্তাহার বিলি করেছে কারা। তাতে কেনেডির দুটো ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। একটা সামনের দিক থেকে তোলা, অন্যটি পাশ থেকে।

তাতে লেখা-

'ফেরারী। রাষ্ট্রদ্রোহী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই লোক চক্রান্ত করে চলেছে। একে ধরা চাই।'

সাতটি চক্রান্তের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

গরম গরম কথায় ভরা খবরের কাগজ সবার হাতে হাতে। প্রেসিডেন্ট এখন অস্টিনে রয়েছেন। কয়েক ঘন্টার ভেতরেই এসে পড়বেন এখানে। তিনি ডালাসের কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যাবেন তারও একটা ম্যাপ ছেপে দিয়েছে দৈনিক 'টাইমস' 'হেরাল্ড'।

এই 'ম্যাপ' দেখেই বাড়িটা বেছে নিল খুনী।

ওই বাড়ির তেতলার একটা খালি ঘরের জানালার পাশে পজিশন নেয় সে। ডালাসের রাস্তার দু'পাশে ঠাসাঠাসি ভাবে অজস্র মানুষ। কেনেডির গাড়িতেই রয়েছেন গভর্ণর কোনালি আর জ্যাকুলিন। নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীরা চলছে আগে-পিছে। খানিকটা খুশিই দেখাচ্ছে প্রেসিডেন্টকে। তাঁর আশঙ্কা বাস্তব হয়নি। প্রচন্ড বিক্ষোভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই তিনি।

এদিকে টেক্সাস থেকে বেশ কিছুটা দূরে ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সনার্ডের টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ম্যানেজার রয় সিহান বিচিত্র এক টেলিফোন বার্তা পেলেন। কাজে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। টেলিফোনের ঝন ঝন শব্দে রিসিভার কানের কাছে তুলতেই শুনতে পেলেন এক উত্তেজিত নারী কণ্ঠ।

'প্রেসিডেন্ট নিহত হতে চলেছেন!' সে ফিসফিসে, অসংলগ্নভাবে বললো। বিস্মিত সিহান কিছু বলার আগেই কেটে গেল লাইন। রিসিভার নামিয়ে রেখে কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন তিনি। তারপর আবার সহজ হলেন। এ ধরনের কথাকে গুরুত্ব দেবার কোনো অর্থ নেই। মজা করার জন্যে এমন ফোন তো কতই আসে। 'দুত্তোরি!' বলে মন দিলেন কাজে।

রাইফেলের নল থেকে বুলেট বেরিয়ে আসতে তখন আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি। সিহান ভুল করলো। টেলিফোন বার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে সাথে সাথে ডালাসের খবর পাঠালে চুকে যেত সব। ওখানকার নিরাপত্তা বিভাগ সতর্ক হতো। বাতিল করে দিত ভাষণের প্রোগ্রাম। বেঁচে যেতো কেনেডি। প্রাণে।

কিন্তু কিভাবে?

আসমান থেকে নেমে এসেছে মৃত্যু পরোয়ানা।

দৃষ্টি পড়ে গেছে আজরাইল আলাইহিস সালামের!

তাকদীর ঠেলে ধাক্কিয়ে নিয়ে আসছে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে।

নির্ধারিত হয়েছে চূড়ান্ত সময় আর স্থান।

কে বাধা দেবে ঐশী আদেশকে?

কে রুখবে?

কে?

'মালাকুল আরহাম' নামে এক ধরনের ফিরিশতা আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। গর্ভে যখন শিশু তখন ফিরিশতা তার রক্ত ও মাংসের সাথে মৃত্যু-স্থানের মাটি মিশিয়ে দেন। ওই মেশানো মাটি একদিন মানুষটিকে টেনে আনে মৃত্যুর জায়গায়। সেখানেই সে মারা যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কোল লাও কুনতুম ফি বুইউতিকুম লাবারাল্লাজিনা কুতিবা আলাইহুমুল কাতলু ইলা মাদাজিয়িহিম।'

'হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরের ভিতরেও থাকো তবু যার মৃত্যু যেখানে আছে তাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে।'

হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম নবীদের সাথে দেখা করতে আসতেন। একবার তিনি সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে এলেন। সেখানে বসা ছিল একজন সুশ্রী যুবক। মৃত্যুদূত তার দিকে তাকালেন। কঠিন দৃষ্টিতে। ভয় পেয়ে গেল যুবক।

চলে গেলেন আজরাইল আলাইহিস সালাম।

যুবকটি বললো, 'হে সোলায়মান নবী! আমার অনুরোধ, আপনি বাতাসকে হুকুম দিন। সে যেন আমাকে এখনই চীন দেশে পৌঁছে দেয়।'

চীনে এসে পড়লো যুবক।

একটু পরেই আজরাইল আলাইহিস সালাম ফের হাজির নবীর দরবারে।

'ব্যাপার কি?' এবার অবাক হবার পালা সোলায়মান আলাইহিস সালামের। জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটাকে কড়া চোখে দেখার কারণ কি?'

'কারণ ওই দিনই তার জান কবজ করার জন্যে আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ করেন।'

'ভালো কথা।'

'কিন্তু আপনার দরবারে নয়। চীন দেশে।'

'সব মহিমা আল্লাহর!'

'তাকে আপনার দরবারে বসা থাকা দেখে অবাক হই। বিরক্তির নজরে দৃষ্টি রাখি তার দিকে। সে ভয় পায়। তারপর বাতাসের আগে পৌঁছে যাই চীন দেশে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সেও। নির্দিষ্ট স্থানে বের করে নিই তার প্রাণ।'

অমোঘ নিয়তি টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেনেডিকে তার মৃত্যুস্থানে।

সিহানকে মাথা ঘামাতে দেয়নি তিনিই।

গুলির শব্দ শুনেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলো ড্রাইভার। দ্রুত গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে পার্কল্যান্ড হাসপাতালের দিকে ছুটলো সে। পাঁচ মিনিটের ভেতর রক্তে নেয়ে ওঠা কেনেডির দেহ শোয়ানো হলো অপারেশন টেবিলে।

নিউরো সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাক্তার কেম্প কার্ল আটজন সহকারী নিয়ে নেমে পড়লেন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষতে। কেনেডির অবস্থা তখন অবনতির দিকে। শ্বাসনালী অপারেশন করে, যাতে তিনি সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হলো। অক্সিজেন ও হৃদস্পন্দনকে সহজ করার জন্যে ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হলো। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে, গুলিবিদ্ধ হবার পঁচিশ মিনিট পর, এ সময়ের সবচেয়ে পরাক্রান্ত বাদশাহ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তম প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি ত্যাগ করলেন শেষ নিঃশ্বাস।

স্কুল বুক ডিপোজিটারির তেতলার জানালা থেকে রাইফেলের মতো কিছু একটা বেরিয়ে এসেছিল, প্রত্যক্ষদর্শীরা একথা জানাতেই পুলিশ ঢুকলো সে বাড়িতে। জানালার পাশেই পাওয়া গেলো একটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বোরের রাইফেল। এ ধরনের অস্ত্র ইতালিতে সামরিক প্রয়োজনে তৈরি করা হয়। তিনটি খালি কার্তুজও পাওয়া গেল সেখানে। পুলিশ জানতে পারলো, কোঁকড়া চুল, বেঁটে ও রুগ্ন চেহারার এক যুবককে মাত্র অল্প কিছু আগে এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেছে। ওই যুবকের অনুসন্ধানে তৎপরতা শুরু হলো।

খুব শীঘ্রই জানা গেলো গোয়েন্দা দফতরের একজন কর্মচারী ও ডালাসের একজন পুলিশ নির্জন এক রাস্তায় মরে পড়ে আছে। হত্যাকারীকে কেউ কেউ দূর থেকে দেখে ফেলেছিলো। চেহারার বিবরণ পেয়ে পুলিশ বুঝতে পারলো তারা যাকে খুঁজছে এ সেই ব্যক্তি। তারপর নানা সূত্রে জানা গেলো, ওই রকম চেহারার একটা লোক ওকব্রিকের টেক্সাস থিয়েটারে ঢুকেছে।

টেক্সাস থিয়েটারে অতর্কিত হানা দিল পুলিশ। গ্রেফতার হলো যুবকটি। জানা গেলো তার নাম লি হার্ভে অসওয়াল্ড। বয়স চব্বিশ। আগে নৌ দফতরের কর্মচারী ছিলো। পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাশিয়া চলে যায়। মাত্র কিছু দিন হয় রাশিয়ান বউকে নিয়ে আমেরিকায় ফিরে এসেছে। কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন একটা সংস্থার সাথে জড়িত ছিল সে আগে একথাও জানা গেলো। এখন সে ক্যাস্ট্রোপন্থী একটা সমিতির সভাপতি।

অসওয়াল্ডকে হাজতে জেরার ভার নিলেন ডালাস গোয়েন্দা বাহিনীর ক্যাপ্টেন উইলি ফ্রিৎস। কুড়ি ঘন্টা ধরে একনাগাড়ে জিজ্ঞাসাবাদ চললো। কিন্তু একটি কথাও বললো না অসওয়াল্ড।

অসওয়াল্ডের রাশান বউ মারিনাকে তলব করা হলো থানায়। প্রয়োজনীয় সূত্রের আশায় প্রশ্নের জালে ঘিরে ফেলা হলো তাকে। ইতিমধ্যে অসওয়াল্ডের হাতের পারাফিন টেস্ট হয়েছে। টেস্টের ফলাফলে ধরা পড়লো নিঃসন্দেহে সে রাইফেল চালিয়েছিলো।

ধীরে আরো সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলো। মারিনার ফ্ল্যাট সার্চ করে পাওয়া গেলো কয়েকটা ফোটোগ্রাফ আর একটা চিঠি। ইতালির তৈরি যে রাইফেল ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে অসওয়াল্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন সব ছবি পুলিশের হাতে এলো। চিঠির বয়ান আরো গুরুত্বপূর্ণ। অসওয়াল্ড শিকাগোর এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ওই রাইফেলটি পাঠাতে লিখেছিলো তারই সম্মতিপত্র।

অসওয়াল্ড যে খুনী-এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও, তার মুখ থেকে একটিও কাজের কথা বের করতে পারেনি পুলিশ। অজস্র প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও নির্বিকার ভাব নিয়েই শুক্রবারটি কাটিয়ে দিলো ওসওয়াল্ড।

ওদিকে এই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সার বিশ্বকে ঠেলে দিল পারমানবিক যুদ্ধের মুখে। আর আমেরিকায় দেখা দিল গৃহযুদ্ধ।

পারমানবিক যুদ্ধের বিপদ সংকেত প্রথম শোনা যায় যখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে, কিউবায় স্থাপিত মিসাইল সরিয় নিতে বলেছিলেন। ওটা আমেরিকার দিকে মুখ করে রাখা হয়েছিল।

গোটা ব্যাপারটার শুরু হয়েছিলো টেক্সাস থেকে। এটা একটা কুখ্যাত শহর। বিশ্বের সব কুখ্যাত, বিদ্রোহী, প্রতিক্রিয়াশীল, নির্দয়, নিষ্ঠুর মানুষগুলোর আবাস। রাজনীতিতে, কোনো ভালো কাজে, উন্নতিতে বাধা দিতে এরা সদা তৎপর।

এই রাজ্যের মানুষ খুবই নারাজ আর অসুখী। কারণ উনিশশো ষাট সালে জন, এফ, কেনেডি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রিচার্ড নিকসনকে মাত্র ক'ভোটে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট হলেন।

টেক্সাসবাসী কেনেডিকে একজন দেশদ্রোহী আর কম্যুনিস্ট বলে কলঙ্কিত করতে চাইলো। তারপর কালোদের ব্যাপারে তার উদার নীতি আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো তাদের। তারা সিদ্ধান্ত নিল কেনেডির নীতিকে কখনো সফল হতে দেবে না।

ডালাসের আড়াই লাখ লোকে হাততালি আর সম্বর্ধনার মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো বুলেট প্রুফ গাড়ি। গাড়ির ছাদ সরানো। জনতার ভালোবাসার সম্মান জানালেন কেনেডি।

ডালাসের গভর্ণরের স্ত্রী নেমী মন্তব্য করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই এবার মত পাল্টেছেন। এতোগুলো মানুষের ভালবাসা আর গভীর আগ্রহ কি আপনি বিবেচনা করছেন? আপনাকে আমরা ভীষণ ভালবাসি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন কেনেডি। 'ওদের ভালবাসা তুলনাহীন।'

কেনেডি খুনের সময় ক্রুশ্চেভ ইউক্রেনে। এ খবর শুনে তিনি হতবাক। ছুটে এলেন মস্কোতে। তক্ষুণি পাঠালেন শোকবার্তা। আমেরিকান দূতাবাসের রেজিস্টার বুকে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্যে। জানালেন, এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত আর মর্মাহত। রাশিয়ার প্রচার মাধ্যমগুলোতে ঘোষণা করা হলো। দুঃখ প্রকাশ করা হলো রাশান সরকারের তরফ থেকে। 'প্রাভদা' ও অন্য সব কাগজগুলোতে ফলাও করে ছাপা হলো কেনেডির অকাল মৃত্যুর খবর। বলা হলো, এ ক্ষতি রাশিয়ারও ক্ষতি।

পেন্টাগণ আমেরিকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট এর হেড কোয়ার্টার থেকে এয়ারফোর্স, নেভী আর আর্মিকে লাল সংকেত দেয়া হলো। যে কোনো প্রকার অবস্থা মুকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে বলা হলো।

গোটা আমেরিকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

সব দোকান পাট, অফিস আদালত, শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ। আমেরিকাবাসী দুঃখ বেদনায় ভেঙে পড়লো। সবাই নিজেদের দোষারোপ করছে। জাতিসংঘের দেশগুলো

শোক প্রকাশ করলো। সারা বিশ্ব হতবাক। সবার প্রশ্ন, 'তাহলে এখন বিশ্ব শান্তির জন্যে লড়বে কে?'

অসওয়াল্ড একই কথা বলে চলেছে, 'না, আমি খুন করিনি। খুনী নই।'

কিন্তু সে কেনেডিকেই শুধু খুন করেনি, গ্রেফতারের আগে আগে পুলিশ অফিসার দীপ্তিকেও খুন করেছিলো।

দু'টি খুনের অপরাধী হিসেবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো।

ডালাস পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে ওয়াশিংটন সি আই এ-র দফতরে পাঠিয়ে দিলো রিপোর্ট। সেখান থেকে বলা হলো সিনেটের বিচার বিভাগীয় কমিটি তদন্ত করবে ঘটনার। পুরো ব্যাপারটার ওপর রহস্যের আবরণ রয়েছে, অস্বীকার করার জো নেই। গোয়েন্দা মহল নানা সম্ভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করছেন।

বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা যখন মূল সূত্র খোঁজার ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন, ঠিক তখনই আঘাত এলো আচমকা।

চব্বিশ নভেম্বর।

অসওয়াল্ডকে কাউন্টি জেলে নেবার জন্য তৈরি করা হলো। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শুধু সাংবাদিকরা ঢুকতে পারবে। ভিড়ের মাঝে ঢুকে পড়লো জ্যাক রুবি। সে স্থানীয় নাইট ক্লাবের পরিচালক। তাকে পুলিশ ভালো করেই চেনে।

তাই কঠোর নিরাপত্তা এড়িয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে সে এসে দাঁড়াতে পেরেছিলো।

বাংলাদেশী সময় রাত এগারোটা দশ মিনিটের সামান্য কিছু আগে অসওয়াল্ডকে লিফটে করে নিচে নামিয়ে আনা হলো। ক্লান্ত বিবর্ণ মুখ।

জাতি তখন টেলিভিশনের সামনে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখছে খুনীকে। হঠাৎ---

একী!

ছুটে আসছে একজন লোক। একটু ঝুঁকে। ভিড়ের মাঝ দিয়ে।

একটা অঘটন ঘটবে আশঙ্কায় গোটা দেশবাসী আঁতকে উঠলো।

ভয়ে হৃদপিন্ডের একটা বিট মিস করলো। দৃষ্টি সবার বিস্ফারিত। সবাই শুনলো গুলির আওয়াজ। বজ্রপাতের মতো। কানফাটানো শব্দ। দেখলো আগুনের ঝলক নিয়ে ছুটে যাচ্ছে গুলি খুনি অসওয়াল্ডের দিকে। পেটে আঘাত করলো সেটা। দুমড়ে গেল অসওয়াল্ড। পার্কল্যান্ড হাসপাতালে নেয়া হলো তাকে। মারা গেল। খানিক পরেই।

পালাতে পারেনি রুবি।

জনাকয়েক গোয়েন্দা আর সাংবাদিক ঝাঁপিয়ে পড়ে আটক করে তাকে।

জ্যাক রুবি।

মাঝ বয়েসী। বায়ান্ন। অবিবাহিত।

রুবি সাক্ষাৎকারে বললো, 'টিভিতে জ্যাকী আর তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কান্না দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। বদলা নেবো।'

রুবি কেন আসলে এ কাজটা করলো আজও জানা যায়নি।

অনেকে অনেক কথা বলেছে। পুলিশ, জনতা, রাশিয়া একেক জনের একেক সন্দেহ।

আসলে অদৃশ্য খবরের মালিক তো আল্লাহ তায়ালা।

আলিমুল গাইব। তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তো ভাই, মৃত্যু এভাবে ওৎ পেতে থাকে। এভাবেই হানা দেয়। আচমকা। অতর্কিতে। হঠাৎ। কাউকে কিছু না জানিয়ে। কাউকে কিছু না বলে।

কিন্তু সে আসবে।

যদি সে জগতের একচ্ছত্র অধিপতিও হয়।

মৃত্যু এসেছিল ফিরআউন ও নমরুদের কাছে। জুলকারনাইন ও সোলায়মানের কাছে।

মুসা, ঈসা, ইসমাইল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াহিয়া, ইয়াকুব, ইউসুফ, ইলিয়াস, ইউশা, শোয়াইব সালেহ, হুদ, দাউদ, জাকারিয়া, নূহের কাছে!

আর?

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে।

বেঁচে থাকতেই কিংবদন্তীর নায়ক হয়েছিলেন অব্রাহাম লিংকন।

শাদা-কালোর মধ্যে কোনও তফাৎ না রেখে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা ও উদ্যম তার ছিল একটা ঐতিহাসিক অবদান। তিনি কালোদের ভোট দেয়ার অধিকার দেন। এতে একদল হয়েছে খুশি আর অন্যরা গিয়েছে রেগে। দু'দলই নানাভাবে বিরক্ত করছিলো তাকে। তারপর তার কাছে আসতে থাকে ভয় দেখানো চিঠি। সেগুলোতেই ছিল হত্যা বা অপহরণের ভয়। ইনটেলিজেন্স ব্যুরো তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ষড়যন্ত্রের তথ্য দিয়ে গেছে। লিংকন সেসব থোড়াই শুনেছিলেন।

'আমার ভাগ্যে যদি এমন মৃত্যু লেখা থাকে তাহলে কেউ কি তা ঠেকাতে পারবে?' লিংকন হেসে বলতেন।

চোদ্দ এপ্রিল।

আঠারোশো পঁয়ষট্টি সাল।

রোজ শুক্রবার।

এদিন প্রেসিডেন্ট লিংকন তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডী মেরী লিংকনকে সাথে নিয়ে এলেন ফোর্ড থিয়েটারে। নাটক দেখবেন। নাম 'আওয়ার আমেরিকান কাজিন' (Our American Cousin)

গোটা জাতি সেদিন মহানন্দে পালন করছে গুড ফ্রাইডে। দিনের আলো ফুটে উঠেছিলো উজ্জ্বলতা আর আনন্দ নিয়ে। ঝকঝকে নির্মল নীলাকাশ। কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। মেরী ট্রেড লিংকনের জীবনে এটি একটি স্বর্গীয় দিন। আজ তিনি ভীষণ সুখী। লিংকনের সাথে থিয়েটারে নাটক দেখতে যাবেন সেজন্যে।

ক'দিন আগেই অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় পার হয়েছে একেকটা দিন। গৃহযুদ্ধের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা থেকে এখন তারা মুক্ত। তারা দু'জন ঠিক করেছেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালনের নির্ধারিত সময় পার হবার পর তারা দীর্ঘ সময়ের ছুটিতে ইয়োরোপে যাবেন। বেড়াতে। মেরী অপেক্ষা করছেন সেদিনের। কবে আব্রাহাম ফের আইনজ্ঞ হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করবেন। শিকাগো কিংবা গ্রীন ফিল্ডে। ভবিষ্যত হয়তো বা সফলতা বয়ে আনবে।

প্রেসিডেন্ট লিংকনের জন্যে এদিনটা ব্যস্ততায় ভরা। অন্যদিনের মতোই। গৃহযুদ্ধে সফলতা অর্জনের মতোই। তিনি উপদেষ্টা মন্ডলির সাথে একমত হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা গুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্যে সব ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সেদিন।

সাঁঝের বেলা।

মেরী যখন লিংকনকে থিয়েটারে যাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তিনি ভীষণ ক্লান্ত। বাইরে কোথাও যাবার চেয়ে বিশ্রাম নিতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মেরীর মন ভেঙে যাবে ভেবে থিয়েটারে যাওয়া ঠিক করলেন। জানতেন, মেরী যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। আর তিনি সাথে গেলে খুব খুশি হবেন। তাই নিজের ক্লান্তি ভুলে মেরীকে সঙ্গদানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঠিক তখনি।

একটা ঘোড়া ছুটছে। তুফান গতিতে।

তার ওপর বসে আছে একজন মানুষ। খুনী।

প্রাণপনে সে ছুটাচ্ছে ঘোড়া। দক্ষিণে।

ফোর্ড থিয়েটারের দিকে।

আব্রাহাম লিংকন আর মেরী বসেছিলো স্পেশাল বক্সে। মেরী সাবধান করে বলেছিল লিংকনকে এমন জায়গায় বসতে যেখান থেকে তাকে জনতা দেখতে পাবে না। আবার তিনি খুব ভালো ভাবে স্টেজের অভিনয় দেখতে পাবেন। কিন্তু এক শিল্প দম্পতি ঠিকই তাকে দেখে ফেললো। চিনলো। অভিবাদন জানালো স্টেজ থেকে। শ্রদ্ধার সাথে।

নাটক দেখছেন। ওরা।

আব্রাহাম আর মেরী। দু'জন।

তৃতীয় দৃশ্য শুরু হবার পয়লাই মেরী লক্ষ করলেন, কাঁপছেন লিংকন।

তিনি ওভারকোট এগিয়ে দিলেন লিংকনের দিকে।

ঘন হয়ে বসলেন।

আচমকা।

প্রচন্ড শোরগোল শুরু হলো বক্সে।

কানফাটানো শব্দে বোমা বিস্ফোরিত হলো। ভীত সন্ত্রস্ত মেরী। চকিতে তাকালেন স্বামীর দিকে। বিস্ময়ে বিমূঢ়।

নিস্তেজ দুটি চোখ। পাথরের মতো। শক্ত কাঠের মতো লিংকনের শরীর। প্রাণহীন। সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

তখনি দেখতে পেলেন। মেজর রথবোন। সে তাদের সাথে এসেছিল। একজন অপরিচিত লোকের সাথে ধ্বস্তাধস্তি করছেন। হঠাৎ তার মনে হলো কোথায় যেন দেখেছেন লোকটাকে।

খুনী লাফ দিয়ে বক্স টপকে পালিয়ে গেলো। বিমূঢ়ের মতো সেদিকে চেয়ে থাকলেন মেরী। নির্বাক।

খুনীর নাম বুথ।

লিংকন থিয়েটারে আসার দেড়ঘন্টা আগে পৌঁছেছে সে। খুনী জানতো ঠিক কোনদিকে প্রেসিডেন্ট আছে। বক্সের প্রবেশ পথের দরজায় ফুটো করে রেখেছিল।

উন্মাদ হয়ে ছিলো বুথ। লিংকনকে খুন করার জন্যে। চারজন সঙ্গীকে নিয়ে খুন করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো সে। তার ধারণা, এই হত্যার মাধ্যমে 'বিপ্লবী' রাষ্ট্রকে ইউনিয়নের নিষ্ঠুর কবল থেকে মুক্ত করতে পারবে। সে হোয়াইট হাউসে নিজস্ব দালাল নিয়োগ করলো। এরা তার কাছে লিংকনের রোজকার কাজের ধারা সম্পর্কে খবর পাঠাতো।

বুথের গুপ্তচর তাকে খবর দিলো যে, আঠারো শো পঁয়ষট্টি সালের চোদ্দ এপ্রিল, শুক্রবার, প্রেসিডেন্ট আর তার স্ত্রী ফোর্ড থিয়েটারে যাবে। এই সুযোগটা কাজে লাগাবে সিদ্ধান্ত নিল সে। ফোর্ড থিয়েটারের সাথে তার খুব জানাশোনা। কাজেই হত্যাকান্ডের জন্যে এটি একটা দুর্লভ সুযোগ।

চোদ্দ এপ্রিল।

বুথ আর তার সাথীরা সারাক্ষণ মতলব আঁটছে। তৈরি হয়েছে তাদের সাঁজোয়া ঘোড়া। খুনের নেশায় মাতাল তারা। বুথের ধারণা অমর হবে সে। এই হত্যাকান্ডের কারণে। ক্রীতদাস প্রথা চালু রাখার পক্ষে ইতিহাসে তার নাম থাকবে। মুক্তিদাতা।

আজ। বুথ।

ভীষণ সতর্ক।

বক্সের প্রবেশ মুখের দরজার ফুটো দিয়ে সে নজর রাখছিল। গুলি ছোঁড়ার সময় যাতে কেউ তাকে আক্রমণ করতে বা বাধা দিতে না পারে তার জন্যে সে আগে থেকেই গ্যালারির দেয়ালের দু'ইঞ্চি পরিমাণ প্লাস্টার খসিয়ে রেখেছিল। সেটা যাতে বোঝা না যায় সেজন্যে এক টুকরো কাঠ দিয়ে জায়গাটা ঢেকে নিল। কারণ থিয়েটারের সবাই তাকে ভালো ভাবে চেনে। জানে। ঘন মেকআপ দিল। পাল্টে ফেললো চুলের স্টাইল। মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ রাখলো। তাকে চেনার সাধ্য রইলো না আর।

গোপনে প্রবেশ করলো বক্সের ভেতরে। অতি নাটকীয় ভাবে একটা ভার্জিনিয়ান প্রবাদ আওড়ালো।

লিংকনের কানে কিছুই গেল না।

খুব তাড়াতাড়ি চেতনা হারালেন তিনি। দ্রুতগতি সম্পন্ন বুলেটের আঘাতে। লুটিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

আড়াই হাজার দর্শক শুনলো বুলেটের আওয়াজ। কিন্তু বুঝলো না কিছুই। কারণ ঠিক তখনি নাটকের দৃশ্যে গুলি ছুঁড়েছে পাত্র। সবাই ভেবেছে শব্দটা বুঝি স্টেজ থেকেই এলো।

বুথও তাই ঠিক করেছিল।

সে অপেক্ষায় ছিল কখন দৃশ্যটা আসবে।

তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমেই সেটা এলো।

গুলি ছুঁড়লো বুথ।

মেজর রথবোন গুলির আওয়াজ শুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বুথের ওপর। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ছুরি দিয়ে আঘাত করলো বুথ। মেজরের বাঁ বাহুতে। ধরে রাখতে পারলো না রথবোন। আঘাত করেই স্টেজের ওপর লাফিয়ে পড়লো। প্রায় দশ বারো ফুট নিচে। পায়ের পাতা আটকে গেল বক্স আর স্টেজের মাঝে। এসব বাধা ডিঙিয়ে বুথ পালিয়ে গেল ঠিকই।

বক্স থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়লো। পালিয়ে যায় দূরে। ওয়াশিংটনকে পেছনে রেখে।

ফোর্ড থিয়েটারে আগুন ধরিয়ে দিতে চাইলো উন্মত্ত দর্শকরা।

গোটা আমেরিকা শোকে মুহ্যমান হলো। বুথকে বলা হলো আমেরিকায় সবচেয়ে কুখ্যাত অপরাধী।

অথচ বুথ ভেবেছিল সে অমর হবে।

তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। এলান হলো।

এগারো দিন এগারো রাত পর। পাওয়া গেল। বুথকে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিলো। আগুন ধরানো হলো। সে বেরিয়ে এলো।

তখনি গুলি করা হলো।

লুটিয়ে পড়লো বুথ।

পড়ে থাকলো তার রক্তাক্ত লাশ।

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারলো না জগদ্বিখ্যাত, আমেরিকার জনপ্রিয়তম রাজা লিংকনকে।

ঠিক দিনে, ঠিক ক্ষণে হাজির।

আজরাঈল আলাইহিসসালাম।

মৃত্যুদূত।

সারা দুনিয়ার বাদশাহ ফিরআউন। খোদা দাবী করে বসলো। সেই খোদার মৃত্যু হলো তারই কথিত 'আমার লোহিত সাগরে'।

নমরুদ আরেক পরাক্রান্ত বাদশাহ।

মাথায় জুতোর বাড়ি খেতে খেতে মৃত্যু হলো তার।

আবু জাহেলের আরেক নাম ছিল ওমর বিন হাকাম। জ্ঞানী ছিল। ছিল সর্দার। মৃত্যু এলো তার কাছে অনেক অপমানের বোঝা নিয়ে। সে মরলো দু'জন বালকের হাতে।

ভবিষ্যত আর অদৃশ্য জগতের সব খবরের অধিকার একমাত্র আল্লাহতায়ালার। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোনো দখল নেই। আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে বলেন, 'বলো, আসমান ও জমিনের অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা; আর কেউ জানে না কখন তারা আবার উঠবে।'

আল্লাহতায়ালা তাঁর অদৃশ্য জ্ঞানের খানিকটা দান করেছিলেন নবী ও রাসুলদের। তাঁরা সেই ক্ষমতাবলে যা কিছু বলেছেন ভবিষ্যতে তা অব্যর্থ ভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে। এসব বাণী অনেক সময় সাধারণ মানুষের বুঝতে অনেক কঠিন হয়েছে। ভেবেছে কি

করে এসব কথা সত্য হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ তায়ালা সব সত্যে পরিণত করেছেন।

শেষ নবী।

শ্রেষ্ঠ নবী।

আকা ই নামদার তাজিদারি মদিনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন দয়ায় অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আর তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। তা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

একদিন।

রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ছেন। আল্লাহর পবিত্র কাবায়। এক সময় সিজদায় গেলেন। দূর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল পাপিষ্ঠ আবু জাহিল। সে সময় তার সাথে ক'জন দুরাচার সাথী ছিল। তারাও ঘোর কাফির। অবিশ্বাসী। দ্রোহী।

তারা হচ্ছে ওতবা বিন রবিয়া।

তার ভাই শায়বা বিন রবিয়া।

ওলিদ বিন উতবা।

আমর বিন হিশাম।

উকবা বিন মুআইত।

উমাইয়া বিন খাল্‌ফ।

আর উমারা বিন আল ওয়ালিদ।

দো জাহানের বাদশাহ্ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সেজদায়। এ দৃশ্য দেখে আসমান খুশি, জমিন খুশি, সূর্য খুশি, নক্ষত্রেরা খুশি, প্রকৃতি খুশি, মহাসমুদ্রের কল্লোল ধারা খুশি, খুশি পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, বাতাস খুশি। খুশি আসমানের বাসিন্দারা।

কিন্তু নারাজ হয়েছে শয়তানের অনুচরেরা।

আবু জাহিল ও তার বাহিনী।

আবু জাহিল সিজদার দৃশ্য দেখতে দেখতে হিংস্র হয়ে উঠলো। তার ভেতর হিংসার আগুন। শয়তান তাকে সাহায্য করলো। বুদ্ধি দিল। সে বুদ্ধি প্রকাশ করলো আবু জাহিল সাথীদের। শুনে সাথীরা মহাখুশি।

সবাই মিলে একটা উট জবাই করে ফেললো। সাত তাড়াতাড়ি। তার তাজা রক্তাক্ত পুঁতিদুর্গন্ধময় নাড়িভুঁড়ি বয়ে এনে সিজদারত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠে ফেলে দিল। সুবিশাল নাড়িভুঁড়ি। তার ওজনও অসম্ভব বেশি। প্রচন্ড চাপে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দম আটকে গেল। তিনি নড়তে চড়তে পারছেন না। রুদ্ধশ্বাস অবস্থা।

দেখে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে কুচক্রী। এই তো! এটাই তো আমরা চাই। তিল তিল করে কষ্ট দিতে চাই। অপমান করতে চাই। কোনো দয়ালু প্রত্যক্ষদর্শী ছুটে গেল মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কাছে। তিনি দৌড়ে এলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কষ্ট দেখে কেঁদে দিলেন। ঝর ঝর করে।

হায়রে মানুষ!

ভালবাসার নবীর এই অবস্থা করলি!

মা ফাতিমা দৌড়ে এসে পিতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এখন কর্তব্য সারতে হবে। আহাজারী করলে চলবে না। ব্যথায় কাতর বুকে পাথর বাঁধলেন। মুছে নিলেন সোনালী অশ্রু।

দ্রুত হাতে নাড়িভুঁড়ি সরালেন পিতার কাঁধের ওপর থেকে। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন দয়ার নবী। মাথা তুললেন।

অশ্রুভেজা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। মা ফাতিমা বললেন, 'বাবা, এইসব দূরাচারকে বদ দোয়া করো।' হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়লেন। শেষে দোয়া করলেন।

'আয় আমার আল্লাহ! উতবা, শায়বা, আমর বিন হিশাম, ওয়ালিদ, উমাইয়া, উকবা আর উমারার সাথে তুমি বোঝাপড়া করো।'

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'শপথ আল্লাহ তায়ালার! আমি ওইসব পাপিষ্ঠদের বদরের যুদ্ধের সময় ধরাশায়ী অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছি। যুদ্ধ শেষে এদেরকে বদরের গর্তে নিক্ষেপ করা হলো।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যাদেরকে গর্তে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ওদের ওপর অভিশাপ ছিলো।'

এদের সাথে আবু জাহিলের নাম না থাকলেও সে এই যুদ্ধেই নির্মমভাবে নিহত হয়। আর ওই বদরের গর্তেই ঠাঁই পায়।

খলিফাতুল মুসলিমীন আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ শুরু হবার খানিক আগে গভীর

রাতে আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গেলেন। বললেন, এখানে আবু জাহিল, এখানে শায়বা, এখানে ওতবা এভাবে বড় বড় কাফিরদের নাম বলে দেখালেন কোথায় তারা নিহত হবে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শপথ করে বলেন, 'পরদিন ঠিক সে জায়গায় পড়েছিল নির্দিষ্ট ব্যক্তির রক্তাক্ত লাশ!'

মক্কার দুর্ধর্ষ নেতা আবু জাহেল।

পন্ডিত, রণ নৈপুণ্যে অসীম দক্ষ আর অমিত শারিরীক শক্তির অধিকারী। মক্কার একশত লড়াকু যুবককে একাই মুকাবিলা করে।

এক হাজারের এক বাহিনী নিয়ে এসেছে সে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে। প্রত্যেকে সশস্ত্র। সুদক্ষ। সুসজ্জিত। মেয়ে কবিরা তাদের উৎসাহ দেয়ার জন্যে গাইছে গান। যুদ্ধের প্রচুর রসদ আর অফুরন্ত খাবার দাবার তো রয়েছেই।

মুসলমানরা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে আসেনি।

তাদের অস্ত্র সীমিত। সাওয়ারী মাত্র ক'খানা। তারা ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। আচমকা তাদের সামনে এসেছে যুদ্ধের ডাক।

দশ জন বেহেশতী। আশরায়ি মুবাশ্‌শিরাহদের একজন হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি বলেন, 'বদরের যুদ্ধে আমি আমার দু'পাশে দুটো কম বয়সী ছেলে দেখতে পেলাম। মনে একথা এলো, আহা! ছেলে দুটো না হয়ে যদি বয়স্ক দু'জন লোক পেতাম! তারা হতো বলিষ্ঠ। লড়াকু। আর রণনৈপুণ্যে দক্ষ। তাহলে আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতাম।

মনের ভাবনা শেষ হয়নি এমন সময় হঠাৎ আমার ডানপাশের ছেলেটা কথা বলে উঠলো। সে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'চাচাজান, আপনি নরকের কীট আবু জাহিলকে চেনেন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি। তুমি হঠাৎ তার পরিচয় জানতে চাইছো? কী ব্যাপার?'

ছেলেটা গভীর আবেগে বললো, 'সে আমার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়। এই নরাধমকে আজ যদি পাই হয় তার দেহ থেকে গর্দান বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো নয়তো আমি শেষ হয়ে যাবো।'

আমি অবাক।

তার কথা শেষ না হতেই বাঁ পাশের ছেলেটা কথা বলে উঠলো এবার। সে বললো, 'চাচাজান, আপনি কি আবু জাহেলকে দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'কেন, তাকে দিয়ে তোমার কি?'

সে বললো, 'আমি শুনেছি জগতের রহমত দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে খুব আজে বাজে গালি গালাজ করে। আজকে আর তাকে ছাড়াবো না। দেখা মাত্রই দোজখে পাঠাবো নয়তো নিজেই শহীদ হবো।'

ঠিক তখনি দেখলাম আবু জাহিল যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। সে তার দলকে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করছে। ব্যস্ত।

'ওই যে, তোমরা যাকে চাচ্ছো, 'আমি বাচ্চাদের উদ্দেশে বললাম। কথা শেষ না হতেই দেখি আমার দু'পাশের দুই বালক নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

চিতা যেমন অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ছুটে যায় শিকারের দিকে তার চেয়েও দ্রুত ওরা পৌঁছে গেছে আবু জাহিলের কাছে। তাদের তরবারি বিদ্যুৎ বেগে আঘাত হেনেছে আবু জাহিলের আর তার ঘোড়ার পায়ে। পা পিছলে পড়ে গেল আহত ঘোড়া। আবু জাহিলকে নিয়ে। ঘোড়ার পুরো ওজন পড়লো তার শরীরে। তারপরেও সে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় দেহ বের করে আনলো। কিন্তু আহত পা নিয়ে দ্রুত উঠে পড়ার আগেই আঘাত হানলো মুয়াব্বাজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। ধরাশায়ী হলো দুরাচার। আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মাথা চেপে ধরলেন। তখনো প্রাণপনে যুঝে চলেছে আল্লাহর দুশমন।

দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে এলেন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

হাঁটু দিয়ে চেপে ধরলেন বুক। গলায় রাখলেন তরবারির তীক্ষ্ণধার ফলা।

'মাসউদ', মুমূর্ষু আবু জাহিল বলে উঠলো, 'মৃত্যুর সময় তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখো।'

আবদুল্লাহ তাড়াহুড়ো করছেন।

আবু জাহেল বললো, 'তুমি আমার গলা সেখানে কাটো যেখানে গলা শেষ হয়ে কাঁধে ঠেকেছে। (অর্থাৎ যেখানে Apple of Adam রয়েছে) সেখানে কেটো না যেখানে গলা শুরু হয়েছে।'

কেন?'

'যাতে মৃত্যুর পর আমার মাথার ওজন বেশি হয়। আমার পাড়ার লোকেরা যখন ওজন দেবে তখন তারা বলবে আমি কতো বড় শক্তিমান বাহাদুর ছিলাম।'

অবিশ্বাসীর মৃত্যুর সময়ের আকাঙ্খা দেখুন।

কথিত আছে মাথাসহ গলার ওজন একমন হয়েছিল।

জ্ঞানী, সর্দার, সম্পদশালী আবু জাহিল মৃত্যুকে ফেরাতে পারলো না।

হায়!

যদি মানুষ এ সহজ সত্যটুকু বুঝে নিত একটু।



পাঁচ

মৃত্যুর কষ্ট যে কী সেই বুঝতে পারে যে মরেছে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির অবস্থা গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে খানিকটা ঠাহর করা যায়। চিন্তা করলেও অনেকটা অনুভব হয়। যেমন শরীরের যে জায়গায় রুহ থাকে না তাকে কেটে ফেললে কোনো কষ্ট হয় না। অ্যানাশথেশিয়া করার সময় কিছুটা বোঝা যায়। যেখানে অ্যানাশথেশিয়া করা হয় সে জায়গাটা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু অস্ত্রোপচারের পর যখন প্রভাব কেটে যায়। প্রাণ চলে আসে তখন টের পায় কী ব্যথা আর যন্ত্রণা।

সুস্থ দেহের কোনো অংশে সামান্য সুঁই ঢোকালেই প্রাণবিদারী কষ্ট হতে থাকে। শরীরের একটুখানি জ্বলে বা পুড়ে গেলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা হয়।

এমন কষ্ট পাবার কারণ হচ্ছে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে প্রাণ।

যখন মৃত্যুর সময় হয় তখন সরাসরি রুহ ধরে টান দেয়া হয়। কাজেই শরীরের প্রতিটি লোমকূপ কী পরিমাণ যন্ত্রণাবিদ্ধ হয় তা একমাত্র মৃত্যুকষ্টে পড়া মানুষটাই বলতে পারে।

শরীরের একটা অংশ কাটা বা পুড়ে গেলে অন্য অংশে প্রাণ থাকে। তাই সে ছটফট করে। তার যন্ত্রণা খানিকটা কমে। শান্তি পায়। কিন্তু যখন প্রাণকে ধরে টেনে বের করা হয় তখন দেহ এমনি দুর্বল হয়ে পড়ে যে ছটফট করারও সুযোগ থাকে না। সে শুধু বড় বড় চোখ মেলে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন---

'যখন তোমাদের প্রাণ কণ্ঠায় এসে পৌছে তখন তোমরা শুধু চেয়েই থাকো। কি, পারো না ফিরিয়ে আনতে (প্রাণকে)?'

শরীর শক্তিশালী হলে বড় নিঃশ্বাসের শব্দ খানিকটা শোনা যায়। দুর্বল হলে তাও যায় না। রুহ বের হয়ে গেলে ধীরে ধীরে প্রতিটা অঙ্গ ঠান্ডা হতে থাকে। পয়লা ঠান্ডা হয় পায়ের দিক। তারপর হাঁটু উরু। এক সময় গোটা শরীর।

প্রতিটি অঙ্গ ঠান্ডা হতে ওই রকম কষ্ট হয় যেন তা কাটা হচ্ছে। রুহ যখন কণ্ঠের কাছে পৌছে তখন চোখে আর আলো থাকে না। ঘোলা হয়ে যায়।

দুই দুনিয়ার বাদশাহ মহান আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিনের প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় মৃত্যু কষ্ট থেকে মুক্তির জন্যে দোয়া করতেন। কান্নাকাটি করতেন।

হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম নিজের সাথীদের কাছে মৃত্যু যাতনা কম হবার জন্যে দোয়া চাইতেন।

'মরণের ভয় আমাকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে গেছে।' ঈসা আলাইহিসসালাম বলতেন।

বলা হয়েছে বনি ইসরাইলের ক'জন দরবেশ একটা জায়গায় গিয়ে পরামর্শ করলো, 'চলো আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি যেন একজন মুর্দা কবর থেকে উঠে তার অবস্থা বলে।'

তারা দোয়া করলো।

সাথে সাথে একজন মৃত লোক কবর থেকে উঠে এলো। তার কপালে অনেক সিজদার চিহ্ন।

'কী জিজ্ঞেস করবে আমাকে?' সে বললো, 'কীভাবে প্রকাশ করবো আমার মৃত্যুকষ্টের কথা! হায়! আজ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে আমি মরেছি। এখনো যন্ত্রণা শেষ হয়নি।'

এমন মৃত্যুকে ভুলে যারা দুনিয়ার সৌন্দর্য আর আকর্ষণে মোহিত ছিল তাদের কথা শুনুন।

পৃথিবীতে যে সব হত্যাকান্ডের রহস্য এখনো বের করা যায়নি তেমনি একটা হলো পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যাকান্ড। একথা সত্য যে, সৈয়দ আকবর আলী খানই ছিলো আততায়ী। দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে প্রকাশ্যে সে লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করেছিলো। কিন্তু পরে কিছু ঘটনায় জানা গেছে হত্যাকান্ডের হোতা একটা সুসংগঠিত দল। আততায়ী হাতের পুতুল ছিল মাত্র। লিয়াকত হত্যার ঘটনার সাথে কেনেডির মৃত্যুর মিল পাওয়া যায়।

সেবার বিশেষ কাজে লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডি সফরে এসেছিলেন। সে সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগ তেমন জনপ্রিয় ছিলো না। এর কারণ কি?

জনতা মুসলিম লীগ নেতৃত্ব পছন্দ করছিলো না। লিয়াকত আলী খান এই এলাকার লীগ বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সিক্রেট সার্ভিস তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো যে তার প্রাণনাশের চেষ্টা চলছে। তাই জনসভা শেষ করে তাড়াতাড়ি করাচি রওনা হওয়া দরকার।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো।

বক্তৃতামঞ্চে লিয়াকত আলী ছাড়া আর কেউ ছিলো না।

বেলা চারটার সময় তিনি রাওয়ালপিন্ডি পৌছান। দলীয় নেতা আর কর্মীরা তাকে বিপুল সম্বর্ধনা দান করে। পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াতের পর স্থানীয় লীগ নেতা ভাষণ দিলো।

এবার মঞ্চে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী।

একা।

তিনি সামনের দিকে চেয়ে উচ্চারণ করলেন, 'বেরাদারানে মিল্লাত -- -- --' আর তার পরেই কণ্ঠ জড়িয়ে গেল তার। দুটো মৃত্যুঘাতক বুলেট ছুটে এলো তার দিকে। দড়াম করে আছড়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের। মঞ্চের ওপর। আধ মিনিট পর আরো ক'বার বুলেট ছুটে এলো।

হতবাক জনতা।

এতো দ্রুত ঘটেছে ঘটনা যে খানিকক্ষণ টেরই পায়নি কী হলো। যখন বুঝতে পারলো তখন স্থির করতে পারছে না কি করবে। প্রথম সারিতে বসা একজন নেতার হঠাৎ হুঁশ হলো। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো আহত প্রধানমন্ত্রীকে। ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি শুরু হলো জনতার। কেউ বুঝতে পারেনি ঠিক কোনদিক থেকে কে গুলি করলো।

চারদিকে আতঙ্ক।

পড়িমড়ি ছুটছে সবাই। নিরাপদ কোথাও যাবার জন্যে।

সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো প্রধানমন্ত্রীকে। মৃত্যুর সাথে লড়াই করলেন খানিকক্ষণ। পাঁচ মিনিটের মাথায় ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল, খুব কাছ থেকে দক্ষ নিশানায় করা হয়েছে গুলি। দুটো একটা ভেদ করেছে বুক। অন্যটা ছেঁদা করেছে অন্ত্র।

আততায়ী আর কাউকে আক্রমণ করেনি। পালানোর চেষ্টা করেনি। সে মঞ্চ থেকে মাত্র ছয় গজ দূরে ছিলো। পুলিশ তার কাছে যাবার আগেই জনতার গণপিটুনিতে সে আধমরা। পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর মুহাম্মাদ শাহ দৌড়ে এসে সৈয়দ আকবরের বুকে গুলি করলো। পাঁচ রাউন্ড। তার অন্য সাথীরাও তাই করলো। মারা গেল। খুনী সৈয়দ আকবর। সাথে সাথে।

পরে পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন কমিশন পুলিশের এই কাজের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে। সৈয়দ আকবর পালাতে চায়নি। প্রতিরোধও করেনি। সেক্ষেত্রে তাকে গুলি করে মেরে ফেলার মাঝে যুক্তিটা কি? যদি আকবর বেঁচে থাকতো তাহলে জানা যেত এই হত্যাকান্ড নিছক এক উন্মাদের উন্মাদনা না কোনো সুসংগঠিত দলের পরিকল্পনা।

কমিশন এখানে দূরভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পায়। সম্ভবতঃ পুলিশ কর্তৃপক্ষ অপরাধের মূল নায়কদের ধরতে চায়নি। তাই আকবরকে মেরে ফেলা হলো।

আকবরের জামা কাপড় তল্লাশি করে পুলিশ দু'হাজার টাকা ও একটা নোটবই পায়। সে সময় এটা অনেক টাকা। নোট বইয়ে লেখা ক'টা লাইন পুলিশকে আকৃষ্ট করে। লেখা ছিলো ---

'একজন আনুগত্যকামী নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা প্রার্থনা করে। নিজের দায়িত্ববোধ ও উৎসাহ দিয়ে সে আল্লাহর ইচ্ছা জানাতে চায়।'

একই পাতায় লেখাটির জবাব দেয়া হয়েছে মনে করা হয়। 'এ পর্যন্ত তুমি সর্বদা আমাদের সাহায্য নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছো। সেটা তোমার বিজয়। আবারও সফল হবে। তবে পুলিশকে এড়াতে পারবে না। দমে যেও না। বেহেশতে ফিরিশতারা অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে।'

আকবর মনে হয় কোনো ধর্ম উন্মাদ দলের সাথে ভিড়েছিলো। যারা তাকে বিপথে নিয়ে যায় আল্লাহ ও রাসুলের কথা বলে।

কিন্তু ইসলাম ধর্মে তো খুন করা পুরোপুরি অবৈধ।

অ্যাবোটাবাদে সৈয়দ আকবরের বাসায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিষ পায় যেমন, কাশ্মিরের মানচিত্র, নকল সোনার ইট, পারসিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ওপর লিখিত বই।

লিয়াকত হত্যার ক'দিন আগে কেনাকাটা করার ছুতোয় রাওয়ালপিন্ডি যায় আকবর। পিন্ডিতে সে গ্রান্ড হোটেলে ওঠে।

জনসাধারণের চাপে সরকার ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস অফিসারকে নিয়ে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে।

আরনি বলেন, আকবর ছিলো ধর্মান্ধ। তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ফসল এই নির্মম হত্যাকান্ড। কি কারণে সে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করলো তা সে-ই শুধু জানে।'

আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

তো ভাই, দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে আজরাইল আলাইহিসসালাম তাকে ক্ষমা করে দেবেন এমন নয়।

মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন---

'হে জ্বিন ও মানুষ! যদি আমার আদেশ মানতে তোমাদের ভালো না লাগে তবে বের হয়ে যাও আমার রাজত্ব থেকে; কিন্তু তোমরা কখনই তা পারবে না।

মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে লঙ্ঘন করে কেউ কখনো কোথাও যেতে পারবে না। তা সে যদি গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমার পিতা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রায়ই বলতেন যে, ওই লোকের ব্যাপারে বড় অবাক লাগে আমার যার ওপর মৃত্যুর চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে অথচ সে এখনো জ্ঞানহারা হয়নি। এখনো তার অনুভব ক্ষমতা রয়েছে। আর যখন তার কথা বলার শক্তি রয়েছে তবু কেন মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে না!'

যখন মৃত্যুর সময় চলে এলো তখন তাঁর হুঁশ, অনুভূতি আর কথা বলার ক্ষমতা ঠিক ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন মুমূর্ষু লোকের মৃত্যুর অবস্থা না বলার ওপর আপনি তো অবাক হতেন আজ আপনি মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে বলুন।'

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উত্তর দিলেন, 'হে ছেলে! মৃত্যুর অবস্থা বলা অসম্ভব। তাও আমি খানিকটা বলছি, মহান আল্লাহতায়ালার শপথ! আমার মনে হচ্ছে যেন কাঁধের ওপর পাহাড় রাখা হয়েছে। আমার পেট যেন বিষাক্ত কাঁটায় ভরা। মনে হচ্ছে আকাশ আর জমিন এক হয়ে গেছে। আমি তার মাঝে। পিষে যাচ্ছি।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে হযরত কাআব আহবার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেন, 'মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলেন।'

কাআব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'মৃত্যু কাঁটাভরা গাছের মতো। যে মানুষের পেটের ভেতর ঢুকানো হয়। কাঁটাগুলো শিরা উপশিরাকে ঘিরে নেয়। তারপর শক্তিমান কোনো পুরুষ সেটাকে টানতে থাকে। আর সেই কাঁটাভরা গাছ চামড়া-গোশত, শিরা-উপশিরা ছিড়ে খুঁড়ে বের হয়ে আসে।'

হযরত ইবনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমরা দশজন লোক হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। একজন আমাদের মাঝ থেকে আনসার জিজ্ঞেস করলেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর সবচেয়ে বেশি সতর্ক লোক কে?' হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মৃত্যুকে বেশি মনে করে আর সেজন্যে বেশি করে তৈরি হয়। তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান নিয়ে চলে যায়।'

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আনন্দ আর খুশিকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয় যে চিন্তা সেই মৃত্যুর কথা বার বার মনে করো। এর মধ্যে বিরাট উপকার রয়েছে তোমাদের জন্যে। তাতে বড় বড় আশা কমে যাবে। মৃত্যুর তৈরি নিতে সাহায্যে করে। দুনিয়ার ওপর বিরাগ জন্মে। ধন সম্পদ কামাই করে শুধু শুধু ছেড়ে যাওয়ার উদ্যম কমে যায়। আখিরাতের পাথেয় জমা করা যায়। তাওবার তাওফিক হয়। কারো ওপর অত্যাচার অবিচার করতে বাধা দেয়। অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া থেকে রক্ষা করে।'

এসব কারণেই মারেফাতের পীর সাহেবরা মৃত্যুর ধ্যান করার তাগিদ দেন।

হাদিসে পাকে এসেছে, 'একজন যুবক সমাবেশের ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মুমিনদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী কে?

হুজুরে পাক সাল্লাল্লালাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে মৃত্যুকে বার বার মনে করে। সে এসে পড়ার আগেই ঠিক মতো তৈরি হয়ে নেয়।

একদিন।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালামে পাক থেকে বলেন-

'আল্লাহ যাকে পথ দেখাতে ইচ্ছে করেন ইসলামের জন্যে তার হৃদয়কে খুলে দেন।'

কেউ বললো 'ইসলামের আলো তার অন্তরে ঢুকেছে এর কোনো চিহ্ন আছে কি?'

জবাব এলো, 'ধোকার ঘর দুনিয়ার ওপর ঘৃণা। চিরদিনের আবাস পরকালের ওপর আকর্ষণ আর মৃত্যু আসার আগেই তার জন্যে তৈরি।'

দুই দুনিয়ার বাদশাহ, দয়ার নবী মানুষের মুক্তিদাতা আকা ই নামদার তাজিদারে মাদিনা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার আম্মার করব জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। পেয়েছি। তোমরা কবরস্থানে যেও। সে মৃত্যুকে স্মরণ করে দেয়। অন্য জায়গায় আছে, 'এতে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। আরেক হাদিসে আছে, দুনিয়ার ওপর থেকে আসক্তি কেটে যায়। পরকালকে মনে পড়ে।'

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'রোগীদের দেখা শোনা করো। জানাজায় অংশ নাও। এতে পরকালকে মনে পড়বে।'

একজন জ্ঞানী লোক কোনো জানাজায় শরীক হলেন। তিনি দেখলেন লোকজন মৃত মানুষটার জন্যে আফশোস করছে। তিনি বললেন, 'নিজের জন্যে দুঃখ করো। তাতে উপকার হবে। মৃত লোকটি চলে গেছেন। তিনি তিনটা বিপদ থেকে এখন মুক্ত। আজরাইল আলাইহিসালামকে তিনি আর দেখবেন না। তার আর মৃত্যু কষ্ট হবে না। অশুভ পরিণতির ভয় আর রইলো না।

নিজের জন্যে আফশোস করো। কারণ তোমার সামনে এই তিনটে মহা বিপদ!

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কোনো এক জানাযার জন্যে যাচ্ছিলেন। পথে একজন জিজ্ঞেস করলো, 'এটা কার জানাযা?' তিনি বললেন, 'এটা তোমার জানাযা! শুনতে খারাপ লাগে। তো আমার জানাযা।'

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'মানুষের হিসাব নেবার দিন আগামীকাল কিন্তু ওরা অলসতা আর অবহেলায় পড়ে আছে।'

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'মানুষের হিসাব নেবার দিন আগামীকাল কিন্তু ওরা অলসতা আর অবহেলায় পড়ে আছে।'

আল্লাহতায়ালা জাল্লাশানহু আরো বলেন-

'এমন কি তাদের মাঝ থেকে যখন কারো মৃত্যু এসে পড়ে তখন সে বলে, হে প্রভু, আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিন। নেক কাজ করে ফিরে আসি। জবাব আসবে, তা কখনো হবে না। সে খামাকা কথা বলছে।'

সময় নাই। সময় নাই।

কখন মৃত্যু এসে পড়বে কারো জানা নেই।

একবার আজরাঈল আলাইহিস সালামকে ক'জন ফিরিশতা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তো এ পর্যন্ত অনেক প্রাণী আর মানুষের প্রাণ নিলে। কখনো কি মনে কষ্ট পেয়েছো?'

আজরাঈল আলাইহিস সালাম একটু যেন হোঁচট খেলেন। একটু অবাক হলেন এমন আচমকা প্রশ্নে। ভাবনায় ডুবে গেলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দু'বার কষ্ট পেয়েছি আমি।'

'কখন? কেন?'

একবার। অনেক আগে।

সাগরের পানি কেটে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো এক জাহাজ। মাঝ সমুদ্রে। হঠাৎ আকাশে টুকরো টুকরো মেঘের আনাগোনা দেখা দিল। ধীরে ধীরে সেগুলো এক হলো। বাতাস হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে গেল। জোরে প্রবাহিত হলো। প্রচন্ড ঘূর্ণি উঠলো। সাগরের ঢেউগুলো হু হু করে ওপরমুখী উঠে নেমে এলো প্রচন্ড শক্তিতে। জাহাজটার ওপর দিয়ে বিশাল পাহাড় সমান ঢেউ বয়ে গেল। বার বার। অনেকবার।

ছিঁড়ে গেল দড়ি দাড়া। পাল গেল হাওয়ায় উড়ে। ভেঙে গেল জাহাজ।

তারপর প্রকান্ড আর প্রচন্ড একটা ঢেউ আছড়ে ফেললো জাহাজটাকে একটা ডুবো পাহাড়ে।

জাহাজ থেকেই খুলে আসা একটা পাটাতনে ভেসে পড়লো একজন মহিলা। সে গর্ভবতী। উথাল পাথাল ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললো সেটা গভীর সাগরের দিকে।

ঠিক তখনি।

আচমকা।

প্রসব বেদনা উঠলো মেয়েটির।

এমন অমানবিক পরিবেশে, অসহনীয় যন্ত্রণার মাঝে আর বিরামহীন চিৎকারের ভেতর দিয়ে জন্ম নিল এক অবোধ শিশু। হাসি ফুটলো মায়ের মুখে। কচি শিশুর দিকে তাকালো। কী সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা! কিন্তু . . .

কে একে রক্ষা করবে?

এই উন্মাতাল ঢেউয়ের রাজ্যে কি খাবে, কি পরবে? শীত গরম থেকে বাঁচাবে কে?

ভাবনায় চিন্তায় মুষড়ে পড়লো মা।

এমনি সময়ে।

আসমান থেকে খবর এলো প্রাণ কেড়ে নিতে হবে ওই মায়ের।

ওহ!

সেই ছিল প্রথম কষ্ট।

এই অকুল দরিয়ায়, প্রচন্ড ঘূর্ণি আর ঝড়ো বাতাসে ছেলেটার কি হবে? বড় ব্যথা নিয়ে জান কবজ করলাম বাচ্চার মা'র।

আমার দ্বিতীয় কষ্ট হয়েছিলো সেদিন।

যেদিন আল্লাহর দ্রোহী শাদ্দাদ তার তৈরি করা বেহেশ্তে প্রবেশ করছিলো।

সে সেই যুগের নবীর দাওয়াতকে অস্বীকার করলো, অবজ্ঞা করলো।

সে বললো, 'কোথায় তোমার আল্লাহ? (আল্লাহ মুক্তি দিন)। কোথায় তোমার বেহেশ্ত? আমাকে দেখাও।'

নবী বললেন, 'চোখ বন্ধ হয়ে গেলেই দেখতে পাবে।'

শাদ্দাদ বললো, 'আচ্ছা! তাহলে তুমি পারলে না দেখাতে? এবার দেখো আমি নিজেই তৈরি করবো বেহেশ্ত।'

আল্লাহর দুশমন শাদ্দাদ কিছু নেয়ামত পেয়েছিলো।

একটা হচ্ছে সে চোখ মেললেই দেখতে পেতো ভূগর্ভের যাবতীয় খনিজ রত্নরাজি।

সেগুলো উঠিয়ে একটা ইট সোনা, একটা ইট হীরা দিয়ে তৈরি করলো একটা সুবিশাল প্রাসাদ। দুনিয়ার সব রত্ন রাজি দিয়ে সাজালো তাকে। দুনিয়ার সেরা রূপসীদের আনা হলো সেখানে। তৈরি হলো বিশাল বাগান।

তারপর মহা ধুমধাম করে সেই বেহেশতে প্রবেশের দিন এলো।

হাজার হাজার হাতি সাজানো হয়েছে।

সাজানো হয়েছে হাজার হাজার ঘোড়া।

হাজার ধরনের বাতির আলোয় এগিয়ে চলেছে চলেছে শাদ্দাদ বাহিনী। বানানো বেহেশ্‌তের অভিষেকে।

বিশাল বাহিনীর প্রথম মানুষ শাদ্দাদ।

মেয়েরা গান গাইছে। ছেলেরা করতালি দিচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে সব আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে এলো একটি ডাক।

'শাদ্দা-আ-আ-দ---

বিদ্যুৎ গতিতে মাথা ঘুরে গেল সবার। সেদিকে। যেদিক থেকে ভেসে এলো এমন সুতীক্ষ্ণ বজ্রপাতের মতো আওয়াজ।

শাদ্দাদ ঘাড় ঘোরালো।

দেখা গেল বেশ দূরে। একটা টিলা। তার মাথায় দাঁড়িয়ে ছেঁড়া তালি দেয়া জামা পরা একজন মানুষ। দারিদ্রের ছাপ চেহারায়। বৃদ্ধ। দীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন শরীর।

এমন একটা মানুষের কণ্ঠে এতো শক্তি! কল্পনা করা যায় না।

সে আবার ডাকলো, 'শাদ্দাদ----! তোমার সাথে আমার কথা আছে। কানে কানে।'

সেনাবাহিনীর সৈনিকরা খতম করে দিতে চাইলা বৃদ্ধকে। কারণ আজকের এই মহা উৎসবের দিনে বাদশার নাম ধরে ডেকে যে কাজে বাধার সৃষ্টি করে তার গর্দান উড়িয়ে দাও।

সবাই সেই প্রস্তাব দিল।

বাদশা শাদ্দাদ বললো, 'না। আজকের দিনে কোনো খুন খারাবি নয়।

আজ যে যা চাইবে তাই পাবে। মনে হচ্ছে এই ফকির কিছু চায়। আমার কাছে। সে খুব বুদ্ধিমান। জানে বাদশা আজ বেহেশতে (?) যাচ্ছে। যা চাইবে তাই পাবে।

ঠিক আছে। ডাকো তাকে। সে আমার কাছে আসতে চায়। কথা বলতে চায়। কানে কানে।'

সৈন্যরা ধরে আনলো বৃদ্ধকে।

শাদ্দাদের ঘোড়া তখন জান্নাতের প্রবেশ মুখে।

এক পা জিনের ওপর অন্য পা দরোজায়। বানানো বেহেশতের।

এবার সে তাকালো বৃদ্ধের দিকে। হাসিমুখে।

কিন্তু মুহূর্তেই মুছে গেল তার চোখের হাসি। একী চোখ! এ দৃষ্টিতে এমন আগুন। এ আগুন কোত্থেকে আসে? সরাসরি দোজখ থেকে! আগুনের হলকা বিদ্যুতের মতো ধাক্কা মারলো শাদ্দাদের শরীরে। গোটা শীরের প্রতিটা লোমকূপে ঢুকে গেল কাঁটা।

থর থর করে কাঁপতে শুরু করলো প্রবল পরাক্রান্ত শাদ্দাদ।

এ কোন্ শক্তি!

নিঙড়ে নিচ্ছে তার শরীরের নির্যাস! অস্থি, পাঁজর, শিরা, উপশিরা ছিড়ে খুঁড়ে ফেলছে!

ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লো শাদ্দাদ।

সে দুমড়ে মুচড়ে গেল।

সে কাঁপা , ভাঙা জড়িত স্বরে শুধালো, 'কে? কে তুমি?'

'আমি মৃত্যুদূত। তোর যম।

'কীক্-কী চাও!'

'তোর প্রাণ।'

'আমাকে একটু সময় দাও। আমি--- একটু ঘুরে দেখে আসি আমার তৈরি করা, অনেক মানুষের কষ্ট, ঘাম, রক্ত আর প্রাণপাত করে তৈরি এই বেহেশ্‌ত---'

'না। এক মুহূর্তও নয়।'

হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ।

লাখ মানুষ একসাথে দেখলো তাদের খোদা, তার নিজের তৈরি জান্নাতের সামনে সেজদার ভঙ্গিমায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। প্রাণহীন কাঠের মতো। বৃদ্ধের পায়ের কাছে পড়লো তার মাথা।

সবাই ছুটে এলো বৃদ্ধের দিকে।

তিনি তখন নেই।

আসমানে।

আমিই ছিলাম সেই বৃদ্ধ।

শাদ্দাদের অনুরোধ শুনে খানিকটা টলোমলো হয়েছিলাম। তার জান নিতে কষ্ট হয়েছিলো।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে আজরাইল! তুমি কি জানো এই শাদ্দাদ কে?'

'হে আল্লাহ গায়েবের মালিক আপনি।'

'শাদ্দাদ ছিলো ওই শিশু। যাকে তুমি কাঠের তক্তার উপর রেখে তার মায়ের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলে।'

'সুবহানাল্লাহ!'

'হ্যাঁ। ওই বাচ্চাকে আমি নিরাপদে তীরে পৌঁছে দিয়েছিলাম। বাঘের দুধ পান করে বড় হলো সে ধীরে ধীরে। তার চোখে সুরমা দিলাম। সে দেখতে পেলো ভূগর্ভের যাবতীয় রত্নরাজি। কিন্তু সে ভুলে গেল আমাকে। অকৃতজ্ঞ। অবাধ্য। বিদ্রোহী। নাফরমান। শাদ্দাদ।

সে মানলো না নবীর কথা।

সে শুনলো না বেহেশতের কথা।

সে মানলো না দোযখ।

সে নিজেই তৈরি করলো জান্নাত।

আর তার তাকদীর তাকে নিয়ে গেল সে জান্নাতের দরোজার সামনে।

নিজের তৈরি বেহেশ্‌ত দেখতে পেল না।

তার আগেই আদেশ দিলাম তোমাকে।'

তো ভাই,

মৃত্যু কাউকে ছাড়ে না।

সে যদি মাটির ওপর ও নিচের যাবতীয় ধনভান্ডারের মালিকও হয়।

হাদিসে পাকে আছে, অনেকদিন আগে এক লোক জীবনে অনেক পাপ করলো। একদিন সে বুড়ো হলো। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। সে তার ছেলেদের কাছে ডাকলো। বললো, 'আমি মরে গেলে তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে। যে ছাইটুকু হবে তা শুকনো জায়গায় ছড়িয়ে দেবে অর্ধেক। বাকী অর্ধেক সমুদ্রে ফেলে দিও।' খানিকক্ষণ চুপ থাকলো একথার পর। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হয়তো আমাকে আল্লাহতায়ালা আর জীবিত করতে পারবেন না। যদি পারেন, তাহলে, আমি জানি আমার চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি আর কাউকে দিবেন না।'

লোকটা মারা গেল। ক'দিন পরেই।

ছেলেরা ঠিক তাই করলো পিতা যেমনটি বলেছিলেন। পুড়িয়ে ছাই হলো। সে ছাইয়ের অর্ধেক ফেললো শুকনো জমিনে। অর্ধেক ফেললো সাগরের পানিতে।

অদৃশ্যে আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন সব দেখলেন।

তিনি রাহিম, তিনি কারিম, তিনি জাব্বার, তিনি সাত্তার, তিনি রাহমান, তিনি দাইয়ান। তিনি খালিক আর তিনিই মালিক।

লোকটার পোড়ানো মৃতদেহের ছাইগুলো এক করার জন্যে নির্দেশ দিলেন সাগরকে। তরঙ্গে তুফান তুলে সাগর প্রতিটি অনু পরমাণু এক করলো। জমিনকে আদেশ দিলেন এবার। সেও বাতাসে ঢেউ তুলে এদিক ওদিক থেকে লোকটির দেহের প্রতিটি কণা জড়ো করলো।

এবার জীবন ফেরার আদেশ করলেন।

জীবন এলো ফিরে।

'ওহে আমার বান্দা!' আল্লাহতায়ালা তাকে বললেন। 'কী ব্যাপার? মৃত্যুর সময় তুমি এসব বলেছিলে কেন?'

লোকটা বললো, 'হে আমার পরমপ্রভু! আপনি সবই জানেন। কোনো কিছুই আপনার অজ্ঞাত থাকে না। হে আল্লাহ! আমি ছিলাম বড় পাপিষ্ঠ। আপনি আমাকে প্রচন্ড শাস্তি দেবেন এই ভয়ে আমি এই কাজ করেছি।'

দয়ালু আল্লাহতায়ালা বললেন, 'যা, তোকে ক্ষমা করে দিলাম।' (বোখারী, মুসলিম)

কিন্তু মৃত্যু আসবে।

আবার জীবিত হতে হবে। আর দাঁড়াতে হবে প্রবল পরাক্রান্ত জগতের প্রভুর দরবারে।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'আবার জীবিত হতে হবে। আর দাঁড়াতে হবে প্রবল পরাক্রান্ত জগতের প্রভুর দরবারে।'

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'আমি তোমাদের মাঝে মৃত্যু আর জীবনের বিধান দিয়েছি। যেন পরীক্ষা করতে পারি কে সুন্দর কর্ম করছো।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

'মানুষ আমার সম্পর্কে উপমা দেয়। কিন্তু ভুলে যায় নিজের কথা। তারা বলে, হাড়ে কে আনবে প্রাণ? যখন সেটা পচে গলে যাবে?'

এভাবেই যুগে যুগে মানুষ আল্লাহতায়ালার অমোঘ বিধান মৃত্যু সম্পর্কে দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছে।

কিন্তু কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক কি এসব বলতে পারে? এ ধরনের প্রশ্ন করার সময় মানুষ নিজের জন্ম বিত্তান্ত ভুলে যায়। সে মনে রাখে না কিভাবে মহান স্রষ্টা তাকে এক ফোটা নাপাক পানির ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলো।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'মানুষ কি জানে না তাকে এক ফোটা নাপাক পানি দিয়ে তৈরি করেছি। তবুও সে তর্ক বিতর্ক করছে!'

অবুঝ মানুষের তর্কের জবাব বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহতায়ালা দিচ্ছেন---

'বলো, তার মাঝে প্রাণ আনবেন তিনিই যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো জানেন।'

যিনি প্রথম হাড় সৃষ্টি করেছেন। আবার হাড়ের মাঝে প্রাণ দেন। তিনিই ফের তাতে সঞ্চার করবেন জীবন। এতে অবাক হবার কি আছে? অবিশ্বাস করার কী আছে? অবিশ্বাস করাটাই তো অসুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির জন্যে বার বার মোনালিসা তৈরি করা কঠিন কি? মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ফান্সিস গঁগা পিকাসো, মাতিস. এরা যেসব কালজয়ী চিত্র, ভাস্কর্য এঁকেছেন সেগুলো ফের রচনা করতে বেগ কি?

মানুষের যদি একবার সৃষ্টি করে আবার রচনা করতে অসুবিধে না হয় তাহলে মহান শিল্পী, স্রষ্টা আল্লাহতায়ালার জন্যে কঠিন কি?

শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হাড়, শিরা, উপশিরা, রগ আর জোড়ার প্রতিটি অনু পরমানু তো আল্লাহতায়ালার চোখের সামনে পুরোপুরি। তিনি সেগুলোকে এক করবেন। প্রাণ দেবেন। এতে অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

যিনি নাপাক পানিকে সময়ের সাথে সাথে জাহাড়, মাংস, শিরা উপশিরা দিয়ে প্রাণ দিচ্ছেন তার জন্যে মৃত্যুর পর ফের জীবিত করা অসাধ্য কি?

আল্লাহতায়ালা জাল্লাশানুহু বলেন--

'তবুও কি সেই স্রষ্টা পারেন না মৃতকে ফের জীবিত করতে?'

বরং একবার সৃষ্টির পর আবার সৃষ্টিতো বেশি সহজ।

আল্লাহতায়ালা বলেন--

'তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দেন; আবার তিনি তাকে রচনা করবেন। এটা তার জন্যে খুবই সহজ।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন---

'তারা কি বোঝেনা যে, পবিত্র আল্লাহ যিনি আকাশগুলো আর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর তাতে কোনো ক্লান্তি আসেনি। তিনি মরাতে প্রাণ আনতে পারেন। আসলে তিনি সব ব্যাপারে সর্বশক্তিমান।'

পবিত্র কালামে পাকের অন্যখানে বলেন---

'আর তার কাছে এটা একটা উপমা যে তুমি মাটিকে দেখতে পাও শুকনো, উষর; তারপর আমি তাতে পানি দিই। তা উর্বর হয়। যিনি মাটিকে প্রাণ দেন তিনি মৃতের জীবন দেন। তিনি তো সব ব্যাপারে সর্বশক্তিমান।'

তো ভাই মৃত্যু হবে।

আর মৃত্যুর পর ফের জীবিত করা হবে।

হবে বিচার।

তারপর দোজখ (আল্লাহ না করুক) নয় বেহেশ্‌ত।

এক হাদিসে আসছে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি রুহকে শিরা, হাড় আর আঙুলের গিরা থেকে বের করে আনেন। কাজেই আমার ওপর মৃত্যুর কষ্ট সহজ করে দিন।'

একদিন।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক সাথে তিন শো তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে যেমন কষ্ট মৃত্যুর যাতনা তেমন।'

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিহাদের জন্যে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত না হও ঘরে বসে তো একদিন মরবে। শপথ ওই আল্লাহর যাঁর হাতে আমার প্রাণ, হাজার জায়গায় তরবারির আঘাতের চেয়ে মৃত্যু যাতনা বেশি কষ্টের।'

ইমাম আওজায়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মৃতেরা মৃত্যুকষ্ট অনুভব করবে।'

হযরত শাদ্দাদ বিন আওস বলেন, 'মৃত্যু ইহকাল আর পরকালের সব কষ্টের চেয়ে বেশি যাতনাদায়ক। কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়ে, গরম পাত্রে পানি ফুটানোর চেয়ে বেশি কষ্টের।

মুর্দা কবর থেকে উঠে যদি মৃত্যুর কষ্টের কথা শোনাতো তাহলে খাওয়া নাওয়া, পরা, ঘুমানো হারাম হয়ে যেতো।

কথিত আছে মৃত্যুর পর হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করলেন, 'মৃত্যুকে কেমন পেয়েছো?'

মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, 'যেন জীবিত একটা পাখিকে আগুনে ভুনা করা হচ্ছে। ওদিকে প্রাণও যায় না আর ওড়ার শক্তি নেই।'

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, 'হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় পাশেই পানি ভর্তি পেয়ালা রাখা ছিল। তিনি বার বার হাত দিয়ে পানি মুখে বুলাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! মৃত্যু যাতনায় আমাকে সাহায্য করো!'

মৃত্যুর সময় আজরাইল আলাইহিস সালাম হাজির হয়।

তার সাথে থাকে সাহায্যকারী ফিরিশতা।

সে সময় মৃত্যুদূতের ভয়াল চেহারা দেখা আক্ষরিক অর্থেই এক বড় শাস্তি। পাপিষ্ঠদের রুহ কবজ করার সময় রুদ্র মূর্তি ধারণ করে। সেটা দেখে সহ্য করা শক্তিমান মানুষের জন্যেও অসম্ভব।

একবার হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আজরাইলকে বললেন, 'তুমি অবিশ্বাসীদের যে চেহারা দেখিয়ে জান কবজ করো তা আমাকে দেখাও।' আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, 'আপনি তা সহ্য করতে পারবেন না।'

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বললেন, 'আমি পারবো।'

আজরাইল বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি অন্য দিকে মুখ ফেরান।'

ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তাই করলেন।

আজরাইল বললেন, 'আচ্ছা, এবার আমার দিকে মুখ ফেরান।'

ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মুখ ঘুরিয়ে চমকে উঠলেন।

ভয়ানক কুৎসিত দৈত্যের মতো দেখতে ঘোর কালো এক অতিকায় অশরিরী তাঁর সামনে দাঁড়ানো। তার দেহের সব লোম সজারুর কাঁটার মতো। খাড়া। তার বিকট দেহ থেকে বেরুচ্ছে অবর্ণনীয় দুর্গন্ধ। নাক মুখ দিয়ে বের হচ্ছে আগুনের হলকা।

নবী ইব্রাহিম জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন।

অনেক পরে তাঁর হুঁশ ফিরলো।

তাঁর সামনে আজরাইল। আগের বেশে।

ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম বলেন, 'পাপীদের অন্য কোনও বিপদ ছাড়া শুধু এই ভয়াবহ চেহারা দেখাই বিরাট আজাব।'

এক লোক সব সময় দোয়া করতো, 'হে খোদা, আমাকে আর সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে ক্ষমা করো।'

আল্লাহর অনুমতি নিয়ে একদিন সেই ফিরিশাত ওই লোকের কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'বন্ধু, আপনি আমার জন্যে কেন দোয়া করেন?'

লোকটি বললো, 'আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমাকে আপনার জায়গায় নিয়ে যান। আর একটা আশা যে আজরাইলের কাছে জেনে আমার মৃত্যুর সময়টা জানিয়ে দিন।'

ফিরিশতা তাকে সেখানেই নিয়ে গেল। এবার আজরাইল আলাইহিস সালামের কাছে মৃত্যুক্ষণটি জানার পালা। তিনি আজরাইলের কাছে গেলেন।

আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, 'তার মৃত্যু হয়েছে। ঠিক করা ছিল সে সূর্যে না আসা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না।'

তো ভাই, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো পথ নেই।

সেজন্যে সব সময় মৃত্যুর জন্যে তৈরি।

প্রতিটি মুহূর্ত দোজখ থেকে বাঁচার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। প্রতি পল বেহেশতে যাবার আপ্রাণ আকাঙ্খা।

সে প্রকৃত মুসলমান।

সে আসল আল্লাহওয়ালা যিনি প্রতি মুহূর্তে মানেন আল্লাহর প্রতিটি আদেশ। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আদর্শ।

আর এর উল্টোটা হলেই চরম বিপদ। ভয়াবহ পরিণতি।

দুনিয়া আখিরাত দুটোই নষ্ট।

মুসলমানের মৃত্যু হবে সুন্দর। বিভীষিকাময় নয়।

দুটি ঘটনা শোনাবো সেজন্যে। যাতে এমন ভুল আমরা না করি।



ছয়

উনিশ শো পঁচাত্তর সাল।

আমি চলেছি তিনচিল্লা চারমাস দেয়ার জন্যে। জীবনের প্রথম তিনচিল্লা। শীতকাল। পায়ে হাঁটার জামাত। ঢাকা থেকে সিলেট। পুরো সফরে সাতানব্বইটি মসজিদে থেকেছি। অষ্টাশি নম্বর মসজিদে পা রাখতে যে পাড়ায় এলাম সে গ্রামটির নাম সম্ভবতঃ গওহরপুর। এখানে থাকেন একজন অত্যন্ত কামেল মানুষ। তাঁর নাম মুহাদ্দিস নুরুদ্দিন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তাঁর গায়ের রঙ। অস্বাভাবিক দীপ্তি তাঁর চোখে। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। আন্দাজ করলাম।

সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার।

আমরা প্রায় দশ পনেরো মাইল হেঁটে ঘন সবুজ গাছপালা ভরা ছায়াঘেরা এই গ্রামে পৌঁছুলাম বেলা এগারোটার দিকে। মনজিল করে মসজিদে ঢুকে দু'রাকাত নামাজ পড়ে নিলাম। পরামর্শ শেষ হলো। আমির সাহেব ঠিক করলেন এলাকার সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী মুহাদ্দিস হুজুরের কাছে আমি (শফিউল্লাহ) ও ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দিন ভাই যাবো।

তাঁর কালো আলোকিত চেহারা দেখে অভিভূত হলাম। এমন জ্যোতির্ময় চেহারা আরেকজনের রয়েছে। তিনি দ্বীনি আকাশের উজ্জ্বল তারা মরহুম হযরত মাওলানা আলী আকবার রহমতুল্লাহিআলাইহি।

আমরা দোয়া চাইলাম। তিনি হাসলেন। ভুবনভুলানো হাসি।

গওহরপুর (নামটা ঠিক মনে পড়ছে না) মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্র ও এলাকাবাসী মুসুল্লি নিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া হয় আজান দিয়ে জামাতে। আজ বৃহস্পতিবার। শবেগুজারি। লোকে লোকারণ্য।

তাহাজ্জুদ শেষ। সেহেরির সময়। মুহাদ্দিস হুজুর জামাতের ক'জনকে নিয়ে বসলেন।

সেহেরি শেষ হলো। তিনি হঠাৎ বললেন, 'মনে হইতাসে তারে গুলি করা হইবো!'

আমরা অবাক।

আমাদের চোখের প্রশ্ন পড়তে পারলেন মনে হয়। খানিক পরে বললেন, 'নোয়াব দেখ্‌সি!'

জানুয়ারি মাসের কনকনে ঠান্ডা।

আমরা বরফের মতো জমে গেলাম। বাতাসে কিসের যেন হাহাকার উঠলো।

এর ঠিক সাড়ে সাত মাস পর।

বারো আগষ্ট। উনিশ শো পঁচাত্তর।

ঢাকা গল্‌ফ ক্লাব।

সাঁঝ পার হয়েছে মাত্র।

ভাদ্র মাসের টানা বৃষ্টিতে ভেজা স্যাঁতসেঁতে ঢাকা। আজ অবশ্য বৃষ্টি হয়নি। একটা গুমোট ভাব। চারদিকে।

গল্‌ফ ক্লাবের ভেতর চলছে চোখ ঝলসানো অনুষ্ঠান। প্রায় শ'খানেক অতিথি হাজির। উপলক্ষ বেঙ্গল ল্যানসারের তরুণ অধিনায়ক মেজর ফারুক আর তার স্ত্রী ফরিদা আজ তাদের বিয়ের তিন বছর।

দেশের ধনী, প্রতিষ্ঠিত সরকারী আর বেসরকারী অনেক বড় বড় মানুষই শরীক হয়েছে এ আয়োজনে। ভেতরে আর বাইরে চলছে আনন্দের জোয়ার। আকাশে নেই এক ফোঁটা মেঘ। চাঁদ উঠেছে। কিন্তু তার আলো ম্লান হয়েছে লনের কুড়িটি রঙিন বাতির সামনে। তার নীলাভ আলোর নিচে জটলা বেঁধে বসে আছে অতিথিরা। হাতে শরবতের গ্লাস। পরম তৃপ্তিতে চুমুক দিচ্ছে তাতে। তাছাড়াও রয়েছে নিষিদ্ধ পানীয়। ওদিকে চলছে ব্যান্ড সঙ্গীত। তার মুর্ছনায় মুখরিত চারদিক।

আজকের এই বিয়ে বার্ষিকী যা ইসলামের কোথাও পাওয়া যায় না। তাতে হয়েছে অনেক অপচয়। টেবিলগুলোতে সাজানো রয়েছে খাসির গোশ্‌তের বিরিয়ানী, কাবাব, গুরু গোশতের তরকারী, রিজালা আর প্রচুর ফলের সালাদ।

অনেক বিখ্যাত লোক এসেছে।

তার মাঝে জেনারেল স্টাফ প্রধান ব্রিগেডিয়ার খালিদ মোশরাররফ, প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক।

নানান ধরনের উপহার এসেছে।

ফারুকের সৈনিকরা এনেছে পাটের তৈরি সুদৃশ কার্পেট। শোয়ার ঘরের জন্যে। ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক এনেছেন গণভবন এর প্রধান মালির তৈরি মৌসুমী ফুলের বিরাট এক তোড়া।

বেচারা তিনদিন পর বুঝতে পেরেছিলেন ওই তোড়াটি তার জন্যে কি কাজে এসেছিল।

এমন একটি জৌলুসময় আনন্দঘন রাত। মানুষের গোপন ষড়যন্ত্র হঠাৎ টুটি চেপে রুদ্ধ, হতবাক করে দিয়েছিল সে রাতের আকাশ বাতাস আর প্রকৃতিকে।

এই আয়োজনে উপস্থিত রয়েছে মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ। সে ঢাকার দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির অধিনায়ক। জুবাঈদার স্বামী। জুবাঈদা হচ্ছে ফরিদার বোন।

সেদিন অস্বাভাবিক খুশি ছিলো ফারুক। সে তার অত্যন্ত প্রিয় অটোম্যাটিক স্লাইড প্রোজেক্টরটা বিক্রি করে ছিলো মাত্র সাড়ে তিন হাজার টাকায়। সে রশিদকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো নিরিবিলিতে। তারপর বললো, 'তিন দিন পর। কাজটা আমি করতে যাচ্ছি। হতে পারে এটাই আমার শেষ পার্টি।'

গুমোট রাতের সেই আতঙ্ক আচমকা চেপে ধরলো রশিদকেও।

সে বিহ্বল। স্তব্ধ।

অপলকে চেয়ে আছে ফারুকের দিকে।

একটা কালো ছায়া স্থির হয়ে থাকলো দুই হত্যাকারীদের ওপর।

ঠিক তখনি

রিক্সাওয়ালা আবদুল কাদের। একজন মুক্তিযোদ্ধা। একজন নিবেদিত প্রাণ তাবলিগী কর্মী। কাকরাইল মসজিদের নিচতলার কালো ঠান্ডা মেঝের পাতলা, ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে শুয়েছিলো।

স্বপ্ন দেখছে সে।

চাঁদের পাশে জমা হয়েছে মেঘ। অনেকগুলো তারা বিশাল থেকে বিশালতর হচ্ছে। দৈত্যের মতো। চারপাশ থেকে চেপে ধরেছে চাঁদকে। প্রচন্ড চাপে চাঁদের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে রক্ত। লাল রঙ টোপায় টোপায় গড়িয়ে পড়ছে তার মুখে। টা-টা-টা-শব্দ হচ্ছে। কিসের শব্দ ওটা? ব্রাশ ফায়ারের? তাইতো? ভয়ানক চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলো আবদুল কাদের। এ কেমন স্বপ্ন! দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। দুটো।

আজ বৃহস্পতিবার। জুমা রাত। চৌদ্দ আগষ্ট।

আজ উম্মতের আমলের খবর যাবে মানুষের মুক্তিদাতা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। অজু করে দাঁড়াতে হবে তাহাজ্জুদের নামাজে।

এই দুনিয়ায় আজ তার আর কেউ নেই।

একদিন সবই ছিলো। স্ত্রী, পুত্র, পরিজন।

একাত্তরে স্ত্রীকে নিয়ে গেছে হানাদারের দোসররা। জীবনটা মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাবলিগে কিছু সময় দেবার পর ফের সান্ত্বনা পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়। পেয়েছে বাঁচা আর মরা, জীবন আর মৃত্যুর আসল দর্শন।

আজকের স্বপ্নটা জীবন্ত!

অস্বস্তিকর।

বুকের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে তার।

কথাটা শুনে চমকে উঠলো রশিদ।

ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখে নিল সে। ভয়। কেউ শুনে ফেলেনি তো? খানিক পর বললো, 'তুমি কি পাগল হলে? এতো সাত তাড়াতাড়ির দরকার কি? পরে সব পন্ড হবে। সাথে নেই অফিসার। নেই অস্ত্র। কী করে এগুবে?'

'এই আমার ফয়সালা, ঝকঝকে চোখে চেয়ে আছে ফারুক। 'আমি একা হলেও শেষ করবো কাজ। ইচ্ছে হলে তুমি সরে দাঁড়াতে পারো। মনে রেখো, যদি সফল না হই, তোমাকে ছেড়ে দেবে না শাসক।'

ঠিক উল্টোদিকে।

ধানমন্ডি। বত্রিশ নম্বর রোড। ছ'শো সাতাত্তর নম্বর বাসা।

এখানে জড়ো হয়েছে টুঙ্গিপাড়ার শেখ পরিবারের সবাই। উপলক্ষ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নির বিয়ে। এই অনুষ্ঠানের শেষে আত্মীয় স্বজনেরা শেখ সাহেবের কাছে দোয়া নিয়ে ফিরে গেল বাড়ি। রয়ে গেলেন বিশেষ ক'জন।

হায়!

আজরাঈল আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়েছিল তাদের ওপর।

যদি তারা বুঝতো?

যদি তারা তৈরি হতো।

যদি অন্তহীন জীবন কতো ভয়াল বিভীষিকার আর অনাবিল আনন্দের জানতো?

যদি দুনিয়ার লোভ, মোহ, আর সব রিপুর তাড়নার উপরে উঠে চরম সফলতার আর শান্তির জীবন বেছে নিতো?

আহ্!

এদের মাঝে ছিলেন শেখ নাসের। প্রিয় বোনের স্বামী আবদুর রব সেরনিয়াবাত। আর ছিলো আবু হাসনাত। ভাগ্না। সেরনিয়াবাতের ছেলে।

সে বেঁচে যায়।

আজরাঈল আলাইহিস সালাম তাকে দেখেনি।

তাক্দীরের লেখা।

ভাগ্য!

সে রাতে।

সবাইকে নিয়ে বন্যা সমস্যার আলোচনা ও পরামর্শ করলেন বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমান।

সমাধানের জন্যে তার মত ছিলো ড্রেজার পরিকল্পনা। কথা বলতে বলতে তিনি স্মৃতির তীর্থে ঘুরে বেড়ালেন। বললেন, 'ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। বৃটিশ আমল। আমাদের দেশে এলো ইংরেজ। ড্রেজার কোম্পানির চাকরিতে। ওদের সাথে মাঝে মাঝেই খেলতাম। ফুটবল। নদীর পাড়ে।'

একদিন। আকাশে উড়ে এলো বিদেশি বিমান। বোমারু। ঝাঁকে ঝাঁকে। শুরু হলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। জড়িয়ে পড়লো উপমহাদেশ। বার্মা তখন অন্যতম সেক্টর। ড্রেজারগুলো বাজ্ হিসেবে কাজে লাগলো। চলে গেল সামরিক অভিযানে।

আর কোনোদিন ফিরে এলো না।

আজ সেখানে আর কোন নদী নেই।

শুধু চর আর চর।'

শেখ সাহেব বললেন, 'আমি ড্রেজারগুলো কাজে লাগাবো।'

তারপর দেশের হত দরিদ্র কৃষকদের উদ্দেশে কথা বলতে বলতে চোখ ভিজে গেল অশ্রুতে।

হায়!

মূঢ় মানুষ!

মূর্খ মানুষ!

অজ্ঞান মানুষ!

হতভাগ্য। দুর্ভাগ্য মানুষ!

সমস্যার সমাধানের জন্যে আল্লাহকে খুঁজে পায়নি সে।

খুঁজে পায়নি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

কোনো কিছুই সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আল্লাহকে ছাড়া। আল্লাহ কখনো সমস্যার সমাধান করেন না তাঁর প্রিয় নবীর আদর্শ ছাড়া। জনপ্রিয়তার এমন তুঙ্গে থেকে যদি গোটা জাতিকে তিনি বলতেন, 'যাও, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হও। তিন চিল্লা চারমাসের জন্যে। শিখে এসো আল্লাহর হুকুম কখন কি? তা কিভাবে নবীর তরিকায় মানতে হয়। দ্বীন শিখে এসো। তোমরা সবাই এই ঘন ঘোর বিপদে আল্লাহ্‌কে ডাকো। তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন বন্যা।'

যেমনটি করেছিলেন নূহের মহাপ্লাবনের সময়।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মহাসুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে উচু চাপ। পাহাড়ে ফাটল। ভূপৃষ্ঠ ফেটে চৌচির। বজ্রপাতের গুরু গম্ভীর আওয়াজ। মাটি চিরে উৎক্ষিপ্ত হলো পানির ফোয়ারা। মহাসাগরের ঢেউগুলো প্রচন্ড গর্জন করে দিক পাল্টে ছুটে এলো স্থলভাগের দিকে। পাহাড় চিরে ছুটে এলো ঝর্ণাধারা। তুমুল গতিতে। আকাশের সব জল নেমে এলো মাটিতে। জলভাগের সব জল উপচে পড়লো স্থলভাগে। গাছের পাতা থেকে ঝরছে অঝোর বৃষ্টির ধারা। শিকড়, কান্ড, মূলসহ উপড়ে উঠে আসছে। ওপরমুখী। পানির তোড়ে!

চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ বছরের বন্যা ছুঁতে পারেনি ওই সব মানুষকে যাঁরা মেনেছিলো আল্লাহর আদেশ আর নুহ আলাইহিস সালামের আদর্শ। তাঁরা অক্ষত, প্রাণবন্ত।

বন্যার ছোবল কোনই আতঙ্কের কারণ হয়নি তাদের জন্যে।

পবিত্র কোরআনের এই বর্ণনা পড়ে যদি শিক্ষা নিতাম আমরা।

আমরা নামে মুসলমান। চলি অবাধ্য আর অবিশ্বাসীদের পথে।

ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে সাত কোটি মানুষের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি অদম্য উৎসাহ আর উদ্দীপনায় কাজ করতে লাগলেন। জনগণের কল্যাণের জন্যে।

কিন্তু তা ছিলো সত্যের সাথে মিথ্যা গুলিয়ে ফেলার মতো। ওই ক্রান্তিলগ্নে খোঁজ নেয়া উচিত ছিলো তাঁর সেসব মহান পুরুষদের। যাঁদের দোয়া যে কোনো সময় কবুল হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাবলিগ জামাদের বাঙলাদেশের আমির হযরত মাওলানা আবদুল আজিজ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, দুনিয়ার সেরা দশজন আধ্যাত্মিক পুরুষের একজন হাজি আবদুল মুকিত সাহেব হুজুর, আশ্চর্য পুরুষ মাওলানা আলী আকবর রহমতুল্লাহি, মাওলানা মুনির আহমাদ রহমতুল্লাহি আলাইহি, বিস্ময় মানব মাওলানা হুরমুজউল্লাহ হুজুর, মাওলানা লুৎফুর রাহমান রহমতুল্লাহি আলাইহি, পীরজী হুজুর, হাফেজজী হুজুর মুফতি ফয়জুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি, মাওলানা আতাহার আলী রহমতুল্লাহি আলাইহি, ফুরফুরার হুজুর, চরমোনাই হুজুর প্রমুখদের সাথে পরামর্শ করা দরকার ছিলো।

এছাড়া পৃথিবীর তাবলিগ জামাতের আমির দিল্লীর সর্বজনমান্য হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহির কাছ যাওয়া উচিত ছিলো।

তাহলে গোটা ব্যাপারটা এমন জটিল, কুৎসিত আর লজ্জাজনক রূপ পেতো না।

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সরলপ্রাণ মানুষ। তিনি এগুলেন ভুল পথে। আর আমরা ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছি যারা তারা উদ্যোগ আর যথাযোগ্য কাজে পরিচয় দিয়েছি অক্ষমতার।

আর এর অন্য একটা কলঙ্কজনক দিক হলো রাজনীতি আর রাজনীতিবিদরা মানুষকে শেখায় সৃষ্টি দ্বারা সমাধান হওয়া। কাজেই জনগণ একজনকে তাদের স্রষ্টা বানিয়ে বাস করে বোকার স্বর্গে। নেতাই সব সমাধান করবেন।

যে জাতির শতকরা আশিজন বেনামাজী, ষাট জন বে-রোজাদার, ধনীরা জাকাত আদায় করে না, হজ্জ্ব করে না আর অপরকে ঈমান আর নেক আমালের দিকে ডাকে না তাদের বাদশাহ তো ভুল করবেই।

তার খেসারত দিতে হলো।

তরুণ মেজরদের সাঁজোয়া গাড়ি এগিয়ে চললো। নির্মম হত্যাকান্ডের পথ ধরে।

সকাল ন'টা।

আট জানুয়ারী, উনিশ শো বাহাত্তর।

হোটেল ক্লারিজেস। মধ্য লন্ডন।

শীতকালের চমৎকার এক সকাল। কোমল রোদ ঘরে ঢুকেছে চুপিচুপি।

ক্লান্ত, শ্রান্ত তিনি বসে আছেণ।

শেখ মুজিবুর রহমান।

দীর্ঘ ন'মাস চোখের সামনে দুলেছে ফাঁসির দড়ি।

কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে?

কত অবলা মায়ের একটানা রোজা, দান, সদকা যে তাকে এমন সুকঠিন নাগপাশ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলো হয়তো তিনি জানতেন। কিন্তু এর কৃতজ্ঞতা কিভাবে করতে হয় তা তিনি বুঝতে পারেননি।

বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

আজ তেইশ দিন হলো। আত্মসমর্পণ করেছে তিরান্নব্বই হাজার সৈন্য।

অবিশ্বাস্য।

আল্লাহতায়ালা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি সবই করতে পারেন। বার বার দেখিয়েছেন। মাত্র তিন শো তেরো জনের নিরস্ত্র, ক্ষুদ্র বাহিনী এক হাজারের বিশাল, সুদক্ষ, সুসজ্জিত, সশস্ত্র বাহিনীকে পরাজিত করেছে। তিনি সব সময় আছেন। মানুষ তাঁর ওপর ভরসা করলে তা করে দেখিয়ে দেন।

তারপর দুর্গম মত্যুগুহা থেকে উদ্ধার করে এনে দিলেন আলো ঝলমল পৃথিবীতে।

এরপরতো কর্তব্যই ছিলো গোটা জীবনটাই দ্বীনের জন্যে উৎসর্গ করা।

ফুলফিকার আলী ভুটো তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি। তিনি আচমকা শেখ সাহেবকে তাঁর সে সময়ের সাংবিধানিক উপদেষ্টা ডক্টর কামাল হোসেন সহ একটা বোয়িং-এ উঠিয়ে দেন।

ভোর ঠিক সাড়ে ছটায় বিমানটি ছুঁলো হিথ্‌রো বিমান বন্দর।

তার দু'দিন পর।

দশ জানুয়ারি, উনিশশো বাহাত্তর।

দেশে ফেরার পালা। ঢাকায় আসার পথে নয়াদিল্লীতে কিছুটা সময় বিরতি দিলেন।

পালাম বিমান বন্দরে তাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হলো। তিনি অভিভূত।

এর ক'ঘন্টা পরই এসে পৌঁছুলেন ঢাকা বিমানবন্দরে।

দাঁড়িয়ে আছে লাখ লাখ জনতা। তাঁর জন্যে। তিনিও দেখছেন তাঁর ভালোবাসার মানুষদের। তাঁর চোখ ভরে গেল অশ্রুতে। বার বার মুছতে লাগলেন পানি।

তিনি পরিণত হলেন 'মানব দেবতায়'!

মানুষ ভুললো আল্লাহকে। তার রাসুলকে।

মুখোমুখি হলেন ইতিহাসের ভয়াবহতম মানবসৃষ্ট দুযোগের মুখোমুখি।

এ ঘটনা থেকে আমাদের শিখতে হবে আমরা ভরসা করবো আল্লাহর ওপর। শান্তি ও অশান্তি, সুখ-অসুখ, সম্মান-অপমান করার মালিক আল্লাহ। এ বিশ্বাস আমি নিজেও অর্জন করবো আর অন্যকেও শেখাবো।

নইলে শুরু হবে মহা বিপর্যয়।

ইতিহাস তার স্বাক্ষী।

এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করবো হোনায়েনের যুদ্ধ।

বারো হাজারের মুসলিম বাহিনী। ছুটে চলেছে।.হোনায়েনের দিকে।

মুসলমানদের চেহারায় নিশ্চয়তা আর গর্বের আলো। কারণ তারা সুসজ্জিত। ফারুকী ও হায়দারী শক্তি তাদের হাতে। আধ্যাত্মিক ও শারিরীক শক্তির অপূর্ব মিলন। দুশমনের চেয়ে সংখ্যায়ও তারা তিনগুণ। শত্রু মাত্র চার হাজার। তাঁদের মনে সাহস এজন্যে যে বদরের যুদ্ধে তাঁরা ছিলেন তিনশো তেরো। ওদের এক তৃতীয়াংশ। আজ তারা তিনগুণ বেশি। কাজেই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হুকুমের অপেক্ষা মাত্র। আটার মতো পিষে ফেলবো আজ ওদের। গোশতের কিমা করে ছাড়বো।

মুসলমান ভুল করলেন।

শক্তির দম্ভে আত্মহারা হলেন। ভুলে গেলেন আল্লাহর কালিমার ভাবার্থকে। আল্লাহ তায়ালা শক্তি ও ক্ষমতার ধার ধারেন না জয়ের জন্যে। সফলতার জন্যে। তিনি বিশ্বাসের মূল্যায়ন করেন। বিশ্বাস থাকলে পরাজয়ের সব নকশার মাঝে জয়ী করেন।

মুসলমানদের দৃষ্টি এবার সংখ্যার আর শক্তিমত্তার ওপর।

আল্লাহতায়ালার ওপর নয়।

হেরে গেল মুসলমান। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না ওদের সাথে।

পিছু হটছে তারা।

একা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!

তিনি ডাকলেন। ঈমানদারদের। ভরসা করতে বললেন আল্লাহতায়ালার ওপর।

এগারো কি বারোজন এসে দাঁড়ালেন।

তিনি ফের ডাকলেন। বললেন, 'আমি আল্লাহর নবী। মিথ্যে নয়। আমি বীর আবদুল মুত্তালিবের বংশ।'

ওদিকে চিৎকার করে ডাকছেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

দ্বীনের জিম্মাদাররা-!

তোমরা কোথায় চলেছো? মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে। আখিরাতকে এড়িয়ে। পালাবে কোথায়? এসো, দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ি দুশমনের ওপর। আলিঙ্গন করো মৃত্যুকে। এসো, বীরেরা-!

কিন্তু ততক্ষণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে তাদের বাহন পশুগুলোর ভেতরও। কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। ফিরতে চাইছে না। যুদ্ধের ময়দানে।

শেষমেশ অনেক চেষ্টায় এক হলেন অষ্টাশি জন। আগে ছিলো বারো। মোট এক শো। তারা কাঁদলেন। আল্লাহর দরবারে। বললেন, 'সৃষ্টি দিয়ে কিছুই হয় না। স্রষ্টাকে ছাড়া। আর স্রষ্টা একা সব কিছু করতে পারেন সবাইকে ছাড়া।'

এবার ঐশী বিশ্বাসে ভরপুর ছোট্ট একশো জনের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত্রু পরাস্ত! পরাভূত!

কেন?

অলৌকিক?

না, বিশ্বাস।

বান্দার বিশ্বাস আর ভরসা পারমানবিক ক্ষমতার চেয়ে বেশি কার্যকর।

বিশ্বাস টেনে নামিয়ে এনেছে ফিরিশতাদের।

তারা লড়ছে।

বিস্ময়কর বিজয় ঘটলো অল্প সময়েই।---

এজন্যে জনতার নেতা তার মানুষকে শেখাবে ঈমান। ভরসা, বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল, ভয়, তাকওয়া উপাসনা, ইবাদাত।

তখন নেমে আসবে শান্তি।

দূর হবে বন্যা সমস্যা।

ড্রেজার আর ফারাক্কা বাঁধা আলোচনা করে নয়। এতো শির্ক!

বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে।

দেশের অবস্থা মোটেও ফিরছে না।

শেখ মুজিবুর রহমান এক অব্যক্ত অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছেন। তিনি যতটা খুশির ভান করতেন ততোটা খুশি তিনি ছিলেন না। তাঁর সারাটি জীবনই কেটেছে মাঠে-ময়দানে, খেতে-খামারে। সাধারণ মানুষের সাথে। আজ তিনি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। প্রশাসকের পর্দাই তার জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ালো।

লন্ডনে থাকতে তিনি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে বলেছিলেন, 'আমি খুব ক্লান্ত। ক'টা দিন বিশ্রাম নিতে চাই। তারপর আমি ফিরে যাবো আমার প্রিয় জন্মভূমি আর জনতার কাছে। প্রতিটি জিলায় ঘুরে ঘুরে জনতার সবকটা মুখ না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো কাজই করবো না।'

কিন্তু দেশে তখন তার জন্যে রয়েছে দ্বিমুখী সমস্যা। প্রশাসন চালু করা। জনতার সেবা।

রাজনৈতিক দলটিতে চলছিলো ভেতরগত ঝগড়া, ক্ষমতার লড়াই আর হিংসা। সে কারণে দেশের অতি জরুরী পাহাড় প্রমাণ সমস্যা যার সাথে জনতার সুখ দুঃখ জড়িয়ে ছিলো সেদিকে মোটেও নজর দিতে পারছিলেন না।

হানাদার হায়েনাদের হিংস্র থাবার চরম আক্রোশে দেশটা একটা বধ্যভূমি আর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো। দোকান পাটে ছিল না কোনো খাবার বা ওষুধ।

এক হাহাকারের রাজত্ব।

স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরন্ধ্র আঁধার দিনগুলোতেও প্রতিটি বাঙালির মনে এক নতুন জীবনের আশার আলো জ্বলেছিলো ধিকি ধিকি। কিন্তু সে আলো নিভে গেল তিন বছর যেতে না যেতেই।

কারণ সমস্যার সমাধান নেতা নিজেই করবেন মনে করেছিলেন। আর অবোধ জনতাও তাঁকে দেবতা পর্যায়ের কিছু ভেবেছিলো। দু'জনেরই আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা ছিলো না তিলমাত্র। ভরসা ছিলো না আল্লাহর ওপর একটুও। আর কোনো বন্ধুত্ব ছিলো না মহান প্রভুর সাথে। ঈমান আর আমাল ছাড়া নষ্ট জীবন!

যুগে যুগে মানুষের চিন্তা আর চেতনা যখন এমন করে আল্লাহহীন আর নবীছাড়া হয়ে গেছে তখনি নেমে এসেছে শাস্তির চাবুক। এ ধরনের চরম বস্তুবাদী মন মানসিকতার বাঙালির ওপর নেমে এলো গজবের খড়গ।

খাদ্য সরবরাহ অবনতির দিকে ছুটে চললো। কারণ প্রশাসন, আমদানী আর বিতরণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালানী ভরে গেছে। চালের দাম সাধারণ মানুষের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। অস্বাভাবিক ভাবে। ঠিক তখনি এলো বন্যা। প্রলয়ঙ্করী। অর্ধেক দেশ তলিয়ে গেল কালো পানির নিচে।

বন্যা চলে গেল।

এলো দুর্ভিক্ষ। মানুষ খেকো বাঘের মতো।

পোকা মাকড়ের মতো মরতে শুরু করলো মানুষ।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন সাতাশ হাজার লোক মারা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে আরো বেশি। লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

এবার আসুন। আলোচনা করি। দুর্ভিক্ষ কেন আসে? দুর্মূল্য কেন হয়?

হাদিসে পাকে আসছে।

'যখন তিনটা কাজ মানুষ করবে তখন চারটা শাস্তি আসমান থেকে নেমে আসে।

(এক) যখন সাধারণ মানুষ ধর্মীয় জ্ঞান শেখার জন্যে প্রকৃত আলিমদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দেয়।

(দুই) যখন বিয়ে শাদী আর অহেতুক অনুষ্ঠানে টাকা পয়সা বেশি খরচ করা হয়। অপচয় হয়। যখন জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি ঘর তৈরি আর তার অহেতুক চাকচিক্য ও বিলাস সামগ্রীর জন্যে অঢেল টাকার অপচয় হয়।

(তিন) সরকারী কর্মচারী যখন আমানতের খেয়ানত করে।

তখন চারটা শাস্তি-

(এক) দুর্ভিক্ষ। কেউ রোধ করতে পারবে না। কোনো সমাধান হবে না।

(দুই) দুর্মূল্য।

(তিন) প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

(চার) আর এমন একজন বাদশা হবে তিনি জনতার কল্যাণের জন্যে যা উদ্যোগ নেবেন সেটা অমঙ্গল আর অকল্যাণকর হয়ে দেখা দেবে।

হাদিস শরীফে এ কথা নেই সে সময় তোমাদের বিদেশী সাহায্য আর রিলিফ সমস্যার সমাধান করবে।

বাঁধ আর ড্রেজার দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ হবে।

ভুল।

ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন নেতা।

জনতা।

সে সময় বাংলাদেশ জাতিসঙ্ঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলো।

শেখ মুজিবুর রহমান সংসদে ভাষণ দেয়ার জন্যে নিউইয়র্ক যাচ্ছেন। বিমানে ওঠার আগে তিনি মন্ত্রীদেরকে দেশের চারহাজার তিনশো ইউনিয়নে একটা করে লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজার সাতশো লঙ্গরখানা খোলা হলো। সেখানে 'না-খাওয়া' মানুষেরা একবেলা সামান্য কিছু খাবার পেতো।

মানুষ পিঁপড়ের মতো ছুটে এলো শহরে। খাবারের খোঁজে। লাখ লাখ মানুষ। দরিদ্র, নিপীড়িত। তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই। ছিন্নমূল জনতা। একাত্তরের ছোবল। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ। আর বন্যা। কোথায় যাবে? চলে এলো তাদের ভরসার নেতার শহরে। নামাজ নেই, রোজা নেই। নেই নবীর আদর্শ। নেই ইবাদাত, উপাসনার স্বর্গীয় জীবন।

একবার।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা আদর্শ ছেড়ে দেয়ার কারণে যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তারা পরামর্শ করলেন। কোন সুন্নাতটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। খুঁজে বের করলেন। মিসওয়াক। যে সুন্নাতের চর্চা করলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়।

শুরু হলো মিসওয়াকের আমল।

দুশমনের মনে পড়লো এর প্রভাব।

তারা রণে ভঙ্গ দিল।

শহরে এসে হাজির হয়েছে হাজার ভিখিরী। লাখ লাখ বাস্তহারা।

তিন জানুয়ারী, উনিশ শো পঁচাত্তর।

ঢাকা শহর পরিষ্কার করা হবে। সেজন্যে দু'লাখ বাস্তহারাকে জোর করে তিনটি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। এর খবর উঠলো ফেব্রুয়ারির দুই তারিখ, পঁচাত্তরে। বিশ্বখ্যাত পত্রিকা 'গার্ডিয়ানে'। ক্যাম্পগুলোর অবস্থা ছিলো সত্যিই মানবেতর। হৃদয়বিদারক।

যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। অথচ তিনি নিজেও ঠিক পরিষ্কার ছিলেন না মানুষের আশা পূর্ণ করেন জগতের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। কাজেই এই ভ্রান্ত ধারণার খেসারত দিতে তৈরি হলো জনতা আর নেতা। দু'দলই।

ডেমরা ক্যাম্পে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়েছিলো। রক্ষী বাহিনী তার পাহারা দিত। এখানে বাস্তহারা ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মতো। তাদের জন্যে ব্যবস্থা ছিলো মাত্র কয়েকটা পায়খানা আর ক'টা টিউবওয়েল। অমানবিক জীবন যাপন শুরু হলো কয়েক হাজার লোকের।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে দেশের ধনী লোকদের জাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিতেন যদি, তাহলে বিরাট তহবিল হতো। তখন এসব ছিন্নমূলদের একটা সুব্যবস্থা করা যেতো। এসব বুদ্ধি পেতেন যদি আল্লাহভক্ত বুজুর্গদের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ভুল পথে তিনি এগুলেন। গুলিয়ে ফেললেন সত্যের সাথে মিথ্যেকে। মধুর সাথে মেশালেন বিষকে। যেসব মহান গুণাবলী তিনি পেয়েছিলেন তা ব্যবহার হলো ভ্রান্ত পথে।

সতেরো মার্চ, উনিশ শো পঁচাত্তর।

পল্টনে এক বিরাট জনসভা হলো। প্রায় লাখ লোকের সমাবেশ ছিল সেটা। সিদ্ধান্ত হলো সেখান থেকে একটা বিক্ষোভ মিছিল হামলা চালাবে বঙ্গভবনে। কিন্তু কী এক গোপন চুক্তিতে সেটা ঘুরে গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানসুর সাহেবের বাসার দিকে। প্রচুর রক্তপাত হলো।

এভাবে দুর্যোগ, দুঃসময় টুটি চেপে ধরলো মানুষের। বাঙালির সোনার বাঙলা গড়ার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল শূন্যে।

সোনার পৃথিবী তৈরি হয় সোনার মানুষ দিয়ে।

মাটির মানুষ তৈবি হয় সোনার মানুষে তখন যখন সে পরম প্রভুর কাছে করে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। কিন্তু সে আত্মসমর্পণ না ছিলো জনতার, না ছিলো নেতার।

শতকরা আশিজন বেনামাজী। ষাট জন বে-রোজাদার।

কিভাবে শান্তি আসবে?

কিভাবে গড়বে সোনার বাঙলা?

যাঁর প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব রাতারাতি অধঃপতিত বাঙালি জাতিকে ধর্মপথে উঠিয়ে আনতে পারতো সেই শেখ সাহেব নিজেই এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা নেননি।

এই শেখ সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলো গোটা বাঙালি জাতি। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন। একাত্তরে তাদের বিপুল বিজয়। শেখ সাহেবের বিস্ময়কর উত্থান। আইয়ুব খানের পতন। সামরিক ষড়যন্ত্র। পঁচিশে মার্চ। হানাদার হায়েনার আক্রমণ। শতাব্দীর কলঙ্কজনক অধ্যায়। মানুষ মরছে। পিপীলিকার মতো। ঝাঁকে ঝাঁকে।

শুরু হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম।

একজন বন্দী মানুষের ডাকে সাড়া দিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। এলো বিজয়।

মৃত্যুগুহা থেকে ফিরে এলেন বন্দী।

তিনি জানতেন কিনা জানি না। তখন লাখ বাঙালি মা রেখেছিলো তার জন্যে রোজা। উনিশ শো বাহাত্তর সাল।

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান দায়িত্ব নিলেন বাঙালির। সব মানুষের সকল চেতনার কেন্দ্রবিন্দু তিনি তখন।

এ সময়টাতেই সুযোগ নিতে পারতেন তিনি।

বাঙালি জাতি যে চরম নির্মম আর পাশবিকতার শিকার হয়েছিলো আর যেন এমন না ঘটে সেজন্যে সবাই যেন আল্লাহর রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য!

তিনি তা করেননি।

বিজয় এলো।

এখন সবার দাবী আমি বিজয়ের অংশীদার।

ভারতীয় বাহিনী বলে বিজয় আমাদের। মুক্তিবাহিনী বলে আমাদের। মুজিব বাহিনী বলে আমাদের। সেনাবাহিনী বলে আমরা না থাকলে উপায় ছিলো না। দেশের আনাচে কানাচে ছিটিয়ে পড়া নাম না জানা গেরিলারা বলে আমাদের। দেশের নিরীহ জনতা বলে আমাদের।

কবি বলেন-

"পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি'
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'- হাসে অন্ত র্যামী।"

হায়!

অভাগা মানুষ!

বিজয় এনেছেন আল্লাহতায়ালা। তিনি সব সময়ই অত্যাচার আর অত্যাচারীর বিরুদ্ধে। তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।

তা নয়। শুরু হলো চাওয়া পাওয়ার আর অধিকার আদায়ের ইঁদুর দৌড়।

চাই, চাই, চাই।

গাড়ি চাই, বাড়ি চাই, টাকা চাই, চাকরী চাই, পারমিট চাই, ব্যবসা চাই।

সেনাবাহিনীতেও তার হাওয়া বইলো।

তারাও চায় প্রমোশন।

চারদিকে বিশৃঙ্খলা। চাওয়ার লোক বেশি। দেয়ার লোক নেই। জাতি অধৈর্য। ত্যাগ তিতিক্ষার বাঁধ ভেঙে গেছে। ন'মাসেই! এখন তারা জীবন যুদ্ধে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়।

অথচ চাওয়ার জায়গা তো একমাত্র আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন।

তার সাথে যিনি পরিচয় করে দেবেন তিনি নিজেও অজ্ঞ।

কাজেই যা হবার তাই হলো।

ষড়যন্ত্রের নাগপাশে বন্দী হলেন তিনি। যুগে যুগে তাই হয়েছে। কবি বলেন-

"কারো কপাল ভাঙে যেমন
নদী ভাঙে তার কূল;
সারা জীবন ধইরা তবু
ভাঙে না যে তার ভুল!"

শেখ সাহেব কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

কারণ আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছিলো। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক। মিল কারখানার উৎপাদন বন্ধ। উত্তর বাঙলায় দুর্ভিক্ষ। ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে কারচুপি।

অর্থাৎ আল্লাহভোলা বাঙালি তখন স্বার্থপরতার এমন জঘন্য অবস্থানে চলে গেছে যে জনতার জন্যে মোটেই কোনো চিন্তা করছে না তারা।

এমন সময় রিলিফের চাল খালাস না করে বন্দর ছেড়ে চলে যায় বিদেশী জাহাজ। আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীরা এ সুযোগেই বাড়িয়ে দেয় তাদের কালো হাত।

অর্থনৈতিক অবস্থার চরম অবনতি। চারদিকে লুটপাট। দুর্নীতিবাজ প্রশাসন।

অসহায় শেখ মুজিব।

ঘরে বাইরে দুশমন দিয়ে ঘেরাও তিনি।

এভাবে পৌরাণিক গ্রীক দেবতার মতো চারপাশের দুশমন ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে তাকে পাগল করে তুললো।

ঠিক তখনি বেজে উঠলো কালো ঘন্টা।

এক বিয়ের আসরে মেজর ডালিম আর তার বউকে অপমান করা হলো।

এর বিচার হলো ভুল।

তাই হয়।

যখনি মানুষ আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখনি তার সিদ্ধান্ত হয় ভুল।

একজন বুজুর্গ বলেন, 'আমি যেদিন এশরাকের নামাজ না পড়ি সেদিন স্ত্রী আর বাড়ির মুরগী আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে।'

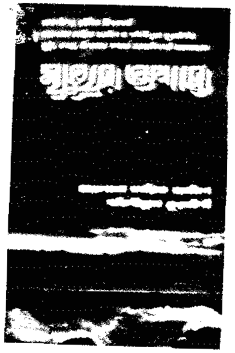
নেক আমালের সাথে মানুষের সব সফলতার এমন নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা কি করে জানবে এসব রাজনীতিবিদরা। তারা ওই পথ জানে যে পথে দ্রোহীরা ছুটেছে চিরদিন।

মেজর ডালিমের ঘটনার পর আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। সেটা হচ্ছে সিরাজ শিকদার হত্যাকান্ড।

অসংখ্য ভুল পদক্ষেপ তছনছ করে দিল সব আশা ভরসা। ভুলের পর ভুল। ভুলের পাহাড় জমা হলো।

হত্যাকান্ডের বীজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ঠিক তখনি ক্ষিপ্ত, পাগল হয়ে উঠলো হত্যাকারীরা।

শান্তি আনার জন্যে বেছে নেয়া হলো খুনের পথ। সেটা ছিল আরেক অপরাধ। আরেক জঘন্য ভুল।



সাত

দুপুর এগারোটা।

চোদ্দ আগস্ট। উনিশ শো পঁচাত্তর।

ভাদ্রমাস। কিন্তু আকাশে নেই মেঘের ছিটেফোঁটা। প্রচন্ড উত্তাপ ছড়াচ্ছে দুপুরের সূর্য। তার নিচে পৃথিবীর বুকের এক অংশ চট্টগ্রামের এক বাজারের মাঝামাঝি রাস্তায় দাঁড়িয়ে হত্যাকারীর স্ত্রী ফরিদা।

দর দর করে ঘামছে সে।

তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। লক্ষণ অশুভ। পথের মাঝে বাধা। যাচ্ছে চট্টগ্রামের বিহারি পাড়া হালিশহরে।সেখানে রয়েছে একজন অন্ধ ফকির। সে নাকি সাধনা করে অতিন্দ্রিয় জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে। তার কাছে জানতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা যাবে কিনা। খুনের পথ ধরে সমস্যার সমাধান! তাতে অন্ধ ফকিরের সম্মতি আছে কিনা। তিনি যদি মানুষ খুন করার অনুমতি দেন তবেই হত্যা করা যাবে শেখ সাহেবকে। আর শেখ সাহেব খুন হলে আল্লাহ খুশি (! ?) হবেন। তখন মাটির বাঙলা সোনার বাঙলায় পরিণত হবে।

আমার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই সামান্য।

কিন্তু কোথাও দেখিনি এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে হত্যা করতে পারে যে কোনো অজুহাতে। হোক সে অপরাধী। অপরাধ দিয়ে অপরাধ দমন করার নীতি ইসলামে নেই।

হাদিস শরীফে আছে, যখন জনগণ সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নির্দেশ দেয়ার কাজ অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ডাক দেয়ার কাজ ছেড়ে দেয় তখন বাদশার জুলুম কায়েম হয়। অর্থাৎ তিনি জনতার মঙ্গল আর কল্যাণের জন্যে একটি উদ্যোগ নেন। ফল

হয় উল্টো। সেটা জনগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাদশার নিয়ত ঠিক আছে। কিন্তু জনতা যেহেতু দাওয়াতের কাজে নেই। নেক আমালে নেই। দেশ জাতি খুব সুখে শান্তিতে বসবাস করবে এমন সমাধানের পথ কোথাও দেখিনি। বরং এটা দেখেছি জনতা যদি দ্বীন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে মঙ্গলের দিকে আহ্বান বা নেক আমালের জন্যে সর্ব সাধারণকে তৈরি করে তখন আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি ফেলেন। ওই একই বাদশার অন্তর পাল্টে যায়। তিনিও দ্বীনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তখন সুবৃষ্টি হয়। সুফসল হয়। ঝগড়া, বিবাদ, হানাহানি, মারামারি, খুন, খারাবি, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই সব বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে। স্থায়ী শান্তি আসে। অভাব অনটন দূর হয়। দাম্পত্য কলহ মিটে যায়।

দেখা যায়, ওই অত্যাচারী রাজা ন্যায় পরায়ণ শাসনকর্তায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু আফশোস!

আমরা গড়ার পথ ছেড়ে ধরি ভাঙার পথ। বেছে নিই ধ্বংস, হত্যা বিপর্যয় আর বিভ্রান্তির রাস্তা। তাই হতে চলেছে।

বিহারি সিদ্ধপুরুষ দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন! ইসলামের নামে। ধ্বংসযজ্ঞ আর হত্যাকান্ডের!

আশ্চর্য!

ঘন্টার ওপর চলে গেছে। একটা বেবী ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

ঘেমে নেয়ে একশা যখন তখন থামলো একটা বেবী। নড়বড়ে, লক্কড় মার্কা।

পথে কয়েকবার বিকল হয়ে গেল বেবী টেক্সি।

সবকিছুর মাঝেই একটা অশুভ ইশারা পাচ্ছে ফরিদা। সে দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে পড়লো। বার বার ঘড়ি দেখছে। সময় যেন পলকে তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

কিছুদিন ধরে ঢাকাতেই ছিল ওরা। গতকাল ফারুক ওদের পাঠিয়েছে। বিকেলে। সাথে ওর মা। ওদেরকে জানতে হবে ফকিরের সম্মতি আছে কিনা এই হত্যাকান্ডে।

তার নির্দেশ ছিল, 'তাকে জিজ্ঞেস করবে আমি পনেরো তারিখে কাজটা করতে যাচ্ছি। আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে।'

দেখুন কান্ড!

আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে সে খুন করতে চলেছে দেশের বাদশাকে। ইসলাম ধর্মে খুন খারাবি করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা কোথাও নেই। এটা যেমন বিস্‌মিল্লাহ্ বলে মদ পান করার মতো (আল্লাহ পানাহ দিন)।

ধর্মযুদ্ধ গুলো তো ওই পর্যায়ে আসে যখন ধর্ম পালন করার কোনো পথ না থাকে।

আপনারাই বলুন, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে এমনটি কি ছিল যে কেউ গোপনে তাহাজ্জুদ পড়বে আর তাকে রক্ষী বাহিনী গুলি করে হত্যা করবে? বা কেউ নফল রোজা

রাখবে তাকে বেয়নেট চার্জ করে ভুঁড়ি ফেলে দেয়া হবে? বা সে কোনো রিক্সা বা ঠেলা গাড়িওয়ালাকে ইসলামের দাওয়াত দেবে সাথে সাথে আইনের লোক তাকে গ্রেফতার করে ডিটেনশনে জেল খাটাবে?

ফারুক বলছে,'.- - - আমি ইসলাম ধর্ম আর দেশের জন্যে এ কাজ করছি। আমি জনগণের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ করছি।'

জনতার বা ইসলামের জন্যে নয়। এ কাজ করা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্রোধ আর প্রতিশোধ পরায়নতা থেকে।

মাঝে ইসলাম নেই। জনতাও নেই।

ফারুক বলছে, ' যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে তৈরি। আমি চাই যে তিনি আমাকে বলুক আমি কি ঠিক পথে চলেছি, না ভুল পথে।'

অন্ধ ফকির যদি সত্যি ধার্মিক, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভক্ত হতেন তিনি বলতেন, 'না, খুনের পথে নয়। ভালবাসার পথে এসো।'

হত্যা সব সময়ই ঘৃণিত।

সেই মুসলমানকে হত্যা করা তো চরম পাপ যিনি বলছেন আমি মুসলমান। একবার এক যুদ্ধে হযরত মেকদাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক অবিশ্বাসীকে ঘায়েল করে বুকে চেপে বসলেন। সে তখন কালিমা তাইয়্যিবা পড়লো। মিকদাদ তবুও তাকে হত্যা করলেন।

এ ঘটনা জেনে গেলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আমিনের মারফৎ। তিনি সাংঘাতিক মর্মাহত হলেন। ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ওই সাহাবীর সামনে।

সাহাবী বললেন, 'সে তো মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে এ কালিমা পড়ে ছিলো!'

হুজুর বললেন, 'তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখে ছিলে?'

দেখুন, কতো স্পর্শকাতর বিষয়।

হত্যাকান্ড হঠাৎ করা তো শয়তানী অনুপ্রেরণা।

এ অনুপ্রেরণায় ঘি ঢাললো আন্ধা হাফিজ।

ফারুক ফরিদাকে দুপুরের মধ্যেই আন্ধা হাফিজের মন্তব্য টেলিফোনে জানাতে বলেছিলো।

কিন্তু হালিশহর পৌঁছুতেই দুপুর হয়ে গেল।

সাতাশ টাকা বেবি ভাড়া দিয়ে ভর দুপুরে পৌঁছালো ফরিদা ফকিরের আস্তানায়।

রিফিউজি মুহাজিরদের কলোনীর ছোট কামরায় একটা ছোট চৌকিতে বসে ছিলো সেই অন্ধ ফকির। তার গায়ে সুতি গেঞ্জি আর লুঙ্গি। ফরিদা একটা বেতের মোড়ায় বসলো।

অন্ধ ফকির ফরিদার হাত নিজের হাতের ওপর নিল।

এখানেও দেখুন ফকিরটির মাঝে শরীয়তের হুকুমের লেশ মাত্র নেই। নইলে সে গায়ের মাহরাম ফরিদার,

একজন মহিলার হাত নিজের হাতে নিতে পারে না। একমাত্র ভন্ডরাই এ কাজটি করে। কোনো সত্যিকার পীর বা দরবেশ মেয়ে লোকের হাত নিজের হাতে নেয়ার আগে মৃত্যু কামনা করবেন।

হাতে হাত নিয়ে ফারুকের পাঠানো খবর শুনলো অন্ধ। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর আবেগঘন স্বরে উর্দুতে বললো, 'উনকা ওয়াক্ত খাতাম্ হো চুকা। যো কারনেকা কারলো। মাগার, চুপচাপসে কাম কারনা।'

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা।

তারপর ফের বললো, 'ফারুককো বোল্‌না, কাম্ শুরু করনেকা পাহলে আল্লাহকি পাস দিলসে দোয়া কারনা।'

'ফারুককে বলবে, কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর কাছে অন্তর থেকে প্রার্থনা করে নেয়।'

দেখুন ---

খুন করতে যাবার আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শেখাচ্ছে। পথভ্রষ্ট হাফিজ।

অথচ হত্যাকান্ড যে কতো নিকৃষ্ট তা প্রকৃত আল্লাহওয়ালা আলিম জানেন। তিনি কখনো খুনের নির্দেশ দিতে পারেন না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক যুদ্ধে লড়াই করছেন। ধরাশায়ী করে ফেলেছেন দুশমনকে। কণ্ঠায় তলোয়ার চালাবেন এমন সময় শত্রু তার মুখে থু থু ছিটিয়ে দিল। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। আর ঠিক পর মুহূর্তেই ছেড়ে দিলেন দুশমনকে।

এমন অভাবিত ঘটনায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো। অবিশ্বাসী। সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে এগিয়ে এলো আলীর দিকে। তারপর অবাক কণ্ঠে শুধালো, ' হে আলী, আমাকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিলে যে!'

'তুমি যে থুথু ছিটিয়েছো, সেজন্য।'

'তাতে তো তোমার আরো রেগে যাবার কথা।'

'সে রাগ আল্লাহর জন্যে হয় না। নিজের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়।

'আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, ভাই আমরা তো যুদ্ধ করি দ্বীন ইসলাম প্রচারের পথ সুগমের জন্যে। ব্যক্তিগত মান অপমান, লাভ লোকসানের জের টেনে হত্যা করা অত্যন্ত নীচ ব্যাপার। এটা ছিলো আঁধারের যুগের প্রথা। আমাদের নবী আসায় এসব অশুভ তৎপরতা শেষ হয়ে গেছে।'

' তোমরা এতো মহান!'

'তা তো জানি না। তবে আমাদের নবী এসব শিখিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা। আল্লাহর জন্যে শত্রুতা পোষণ করা। নিজের ব্যক্তিগত মান সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যে নয়।'

'আমি তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই।'

'তুমি পড়ো লা-ইলাহা ---

তলোয়ারে নয় উদারতায় ইসলাম ছড়িয়েছে দিকে দিকে। হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে নয় ধৈর্য, সহ্য, উদারতা দিয়ে এসেছে শান্তি। সমাধান।

ফরিদা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। যাবার আগে সে অন্ধ ফকিরকে দোয়া করতে বললো। যাতে খুন পর্ব সুষ্ঠুভাবে হয়!

অন্ধ বললো, ' ভেবো না। আল্লাহ তাদের সহায়।'

খুনীদের প্রতি আল্লাহ সহায়?! চিন্তা করুন। কত বড় প্রলাপ!

ফরিদার ভোগান্তির সীমা নেই। সে মহাকষ্টে ফিরে এলো বাপের বাসায়। এসে দেখে টেলিফোন লাইন অচল। ঢাকার সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। দু'ঘন্টা পরে লাইন পেলো। কিন্তু ওদিক থেকে জবাব আসছে না। এবার বোনের বাসায় টেলিফোন করলো। সেখানের কথা বোঝা যাচ্ছে না। উপায় না দেখে শ্বশুরকে ফোন করলো। রিসিভার ওঠালেন শ্বশুর।

ফরিদা বললো, 'ফারুককে খুব দরকার। তাকে এখনি টেলিফোন করতে বলুন।'

ফারুক তখন গাঢ় ঘুমে।

বিকেল পাঁচটায় অন্ধ ফকিরের ভয়ঙ্কর নির্দেশ শোনাতে পারলো ফরিদা তার জামাইকে।

ফারুক আর রশিদ যখন হত্যার চক্রান্ত চালাচ্ছে তখন মাত্র আধ মাইল দূরে শেখ সাহেবের পুরো পরিবার জমা হয়েছে। বেশ ক'টি উপলক্ষে।

আসলে আজরাঈল আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়েছে এই বংশের ওপর।

রাত দশটা। চোদ্দ আগস্ট।

ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যানসার আর দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির একসাথে মহড়া শুরু হলো। ছ'শো সৈন্য। দু'ইউনিট মিলিয়ে। ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ সীমায় ইউনিট লাইন। বারি ট্রাকে চড়ানো হলো ১০৫ এম এম কামান। ক'টা ট্রাকে জায়গা নিল আঠারোটা কামান। ট্রাকের মুখ এখন নতুন এয়ারপোর্টের দিকে। বিমান বন্দরটি তখনো চালু হয়নি।

ঠিক উল্টোদিকে।

বেঙ্গল ল্যানসারের টি-৫৪ ট্যাংকগুলো অশীরীরি দানবের মতো ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে এলো। একে একে। আটাশটি।

বিমানবন্দরে এসে এক হলো দুই রক্ত পিপাসু দানব। জায়গাটা টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের সাথে। সুবিশাল খোলা মাঠ। মাথার ওপর দিকচিহ্নহীন কালো আকাশ। কতো তারা ফুটে রয়েছে। তারা কী দেখছে?

হায়!

একদিন এই মানুষকে সৃষ্টি করার আগে ফিরিশতাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন আল্লাহতায়ালা। আমি তৈরি করতে যাচ্ছি মানুষ। তারা পৃথিবীতে হবে আমার খলিফা।

ফিরিশতারা বিনীত স্বরে, সভয়ে বললো, 'হে আমাদের মহান প্রভু! আপনি কি এমন এক জাতি তৈরি করছেন যারা নিজেদের মাঝে ঘৃণা ছড়াবে, চক্রান্ত করবে, ষড়যন্ত্র পাকাবে, হিংসার আগুন ছড়িয়ে দেবে! স্বার্থ নিয়ে শুরু করবে হানাহানি আর মারামারি। এমনকি তারা হত্যা করবে এক অন্যকে!'

আজ সে দৃশ্যই রচিত হতে চলেছে।

হায়! কী লজ্জা! মানবের!

হাদিস শরীফে আছে, 'হত্যাকারীকে সবচেয়ে আগে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। যদি তাকে মাফ করে দেয়া হয় তবে সবার শেষে সে বেহেশ্‌তে যাবে।'

কাল হাশরের মাঠে সবচেয়ে প্রথম যে বিচার হবে তা হচ্ছে মানুষ খুন করার। এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হবে। হত্যাকারীর হাতে নিহত মানুষটির গর্দান নিয়ে আসবে। সেই গর্দান থেকে নালিশ উঠবে, 'হে আল্লাহ, সে আমার প্রাণ হরণ করেছিলো। কেন?'

কোনো কোনো আলিম বলেন মুক্তি পাবে না খুনী। যদি ঈমান থাকে তবু সে জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে না।

তবে তাওবাকারীর কথা আলাদা। তার তো সব গুনাহই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। যেমন বনী ঈসরাইলের এক লোক এক শো মানুষকে হত্যা করেছিলো। পরে অনুতাপের আগুনে পুড়ে তাওবা করে। দয়ালু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

চলছে।

হত্যাকান্ডের মহড়া।

মহা দুর্যোগের ঘনঘটা এগিয়ে এলো।

সৈন্যরা গোটা ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করেনি। কারণ ট্রেনিং রুটিনে রদবদল প্রায়ই হয়। মেজর রশিদ ছটা ১৫০মি. মি যুগোশ্লাভ হাউইটজার আর প্রচুর অ্যামুনিশন যোগাড় করলো। ক্রুরা জানতেই পারলো না, রশিদের নির্দেশে কামানের লক্ষ্য স্থির করা হলো এখান থেকে চার মাইল দূরে রক্ষী বাহিনী হেড কোয়ার্টারের দিকে।

ইউনিট হেডকোয়ার্টারে ক্রুসহ আরো এগারোটা কামান রাখা হলো। আঠারো নম্বর কামানটি ল্যানসার গ্যারেজের ক্রুদের সাথে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

জমে উঠেছে নাটক।

কালো রাত। কালো পোশাক পরা একদল রক্তপিয়াসী ছুটাছুটি করছে।

কমান্ডারদের এই উত্তেজনার কারণ ধরতে পারছে না সাধারণ সৈনিকরা। সময় এগিয়ে চলেছে।

রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটের দিকে হাজির হলো আরো ক'জন রক্তচোষা বাদুড়। মেজর ডালিম, মেজর নুর, মেজর হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর পাশা, মেজর রাশেদ চৌধুরী। এরা ইউনিটের বাইরের অফিসার। বিকেল থেকেই তারা পায়চারি করছিলো ক্যান্টনমেন্টের আশপাশে।

গভীর রাত নামতেই একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পড়লো।

এদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো রশিদ। এত দেরি হওয়াতে খানিকটা ক্ষিপ্ত হলো ফারুক। এরা ছাড়া প্রতি ইউনিটে মাত্র চারজন অফিসার ছিলো। দু'জন অফিসারের ওপর পুরো বিশ্বাস না থাকায় মহড়া থেকে বাদ দেয়া হয়।

সেনাবাহিনীতে রয়েছে দুটো দল। একদল মুক্তিযোদ্ধা অন্যটি পাকিস্তান ফেরত। শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি বিশেষ করে পাকিস্তান ফেরতদের কাছে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এছাড়া ক'জন অফিসারের পদচ্যুতি ও এই প্রতিশোধের মহড়ার অন্যতম ইন্ধন ছিল।

ফারুক জানে মুজিবের বিরুদ্ধে কিছু করতে বললে এরা দ্বিধা করবে না। কারণ এদের ক্যারিয়ার, ভবিষ্যত আর উচ্চাশার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছিলো।

তাছাড়া শেখ সাহেব প্রকাশ্যে বলেও ছিলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো আমরা একটা দানবের সৃষ্টি করতে চাই না।'

কিন্তু ঘটনা সেভাবেই এগিয়েছিলো।

উনিশ শ পঁচাত্তর সালের এপ্রিল মাসে মেজর রশিদ বদলি হয়ে এলো। দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। এতে খুব খুশি হলো ফারুক। কারণ দুই ভায়রা মিলে পরিকল্পনা এগিয়ে নিতে পারবে। দু'জনের মিলিত সৈন্য দাঁড়ালো চোদ্দশো। রশিদের আর্টিলারি আর ফারুকের ল্যানসার দিয়ে যে কোনো প্রতিরোধ মুকাবিলা করা যাবে।

কিন্তু দটো খুনি দল এক হবে কী করে?

শয়তান সে কাজেও সহায়তা করলো। সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের নিয়ম হচ্ছে বেঙ্গল ল্যানসার মাসে দু'বার মহড়া করতে পারবে। এই চর্চার সময় ট্যাংক ও বারি অস্ত্রের আওয়াজ হবে। আর প্রায় ছ'মাস ধরে। তাতে এমন মহড়ায় পরিচিত হয়ে যাবে এলাকার সবাই। মেজর রশিদ তার উপরের কর্মকর্তাদের কাছে আর্জি পেশ করলো। তার আর্টিলারি আর বেঙ্গল ল্যানসারের একসাথে ট্রেনিঙের সুযোগ করে দেয়া হলো। এতে দু'দলই অনেক কিছু শিখতে পারবে। হেড কোয়ার্টার এটাকে ভালো চোখেই দেখলো। রাজী হলো।

এক হলো খুনীরা।

এরপর রশিদ আরো বেশ ক'টি ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করে। তা হচ্ছে হত্যাযজ্ঞের কূটনৈতিক দিকগুলো। সে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে সহযোগিতার জন্যে রাজী করায়। তারপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব ক'জন মেজরকেও এই হত্যাকান্ডে জড়িত করতে আগ্রহী করে তোলে।

শয়তান আঁটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছে।

সে তো এটাই চায়।

দুনিয়ার মান মর্যাদার কারণে দু'দল মুসলমানকে লাগিয়ে দেয়া।

মেজর রশিদের এক বন্ধু হচ্ছে মেজর শাহজাহান। সে তখন জয়দেবপুরে। ষোলোতম বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির অধিনায়ক। রশিদ তাকে বলেছিলো সে যেন আজ রাতে নতুন বিমান বন্দরের মাঠে তার সৈন্যদের নিয়ে মহড়ায় অংশ নেয়।

রাত সাড়ে দশটার সময় শাজাহানের ফোন এলো। সে বললো, 'আমার সৈন্যরা ক্লান্ত। আসতে পারবো না।' শুনে গর্জে উঠলো ফারুক। বললো, 'বাঘের বাচ্চারা বিড়াল ছানা হয়ে গেছে!'

অন্যান্য মেজররা এসে যাওয়াতে কাজ শুরু হলো।

নেতা হলো ফারুক। সে এই হত্যাযজ্ঞের সর্বাধিনায়ক।

শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন হত্যা করা হবে তা সে বোঝালো। আর এ হত্যাকান্ডে সবার মত আছে কিনা জানতে চাইলো। সবাই রাজী।

এবার ফারুক টেবিলের ওপর বিছালো ঢাকা শহরের ট্যুরিস্ট ম্যাপ। যে সব জায়গায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া হবে, যেখানে আক্রমণ করা হবে তাতে দাগ দিল।

সে হিসেবে একটা ট্যাঙ্ক বিমান বন্দরের রানওয়ে আটকাবে। আর সৈন্যরা একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে পাহারা দেবে মিরপুর ব্রিজ। অন্য দলগুলো পাহারা দেবে বেতার কেন্দ্র, বঙ্গভবন আর বাংলাদেশ রাইফেলসের সদর দফতর পিলখানা ব্যারাক।

তিনটি দল সাজানো হলো। সৈন্য সংখ্যা থাকলো পঁচাত্তর থেকে দেড়শো জন। লক্ষ, শেখ মুজিবুর রহমান, ফজলুল হক মনি আর আবদুর রব সেরনিয়াবাত।

ডালিমকে দায়িত্ব দেয়া হলো শেখ মুজিবুর রহমানকে খুন করার জন্যে। সে রাজী হলো না। কারণ তার পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ওই পরিবারের সাথে। সে দায়িত্ব নিলো সেরনিয়াবাতের বাড়িতে আক্রমণ চালানো।

মেজর নুর আর মহিউদ্দিন নিলো শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত খুনের দায়িত্ব। তাদের সাথে দেয়া হলো ল্যানসারের এক কোম্পানি।

ফারুকের অত্যন্ত আস্থাভাজন এনসিও (নন কমিশন্ড অফিসার) রিসালদার মুসলেহউদ্দিন ওরফে মুসলিমকে দেয়া হলো শেখ মনির বাড়িতে আক্রমণের দায়িত্ব। তাদের উপর নির্দেশ ছিলো -- শেখ মুজিব, সেরনিয়াবাত আর শেখ মনিকে হত্যা করার। এবং মুজিবের দুই পুত্র শেখ কামাল আর শেখ জামালকে বন্দী করার। আর কাউকে কিছু করা বারণ ছিলো। তবে, পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন যে কাউকে প্রয়োজনবোধে নিশ্চিত করে দেয়ার নির্দেশ রইলো। আসলে এই নির্দেশ হত্যাযজ্ঞের পরিধি প্রশস্ত করার পথ খুলে দিলো।

ফারুকের মতো, রশিদের দায়িত্ব ছিলো রাজনৈতিক গুটিগুলো সঠিকভাবে চালনা করা। অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রশিদ স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের কাছে যাবে, যাতে করে সে তার মিগ-জঙ্গী বিমান নিয়ে প্রস্তুত থাকে। ঢাকার বাইরে থেকে কোনো সেনা ইউনিট ঢাকায় আসার চেষ্টা করলে, সে তা ঠেকিয়ে দেবে।

এছাড়া, রশিদের উপর আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তায়। তার একটা ছিলো, খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে আসা। রেডিও স্টেশনে পৌঁছে মুজিব হত্যার ঘোষণা দেয়া, আর দেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদের নাম ঘোষণা করা। অন্য দায়িত্বটি ছিলো, মুজিব হত্যার পর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালানো। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ফারুক তার সহকর্মী অফিসারদের মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পেরেছিলো। তার জানা ছিলো যে, ঢাকায় কোন সেনা ইউনিটকে প্রস্তুত করতে তাদের কমপক্ষে দু'ঘন্টা সময় লেগে যাবে। সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলো যে শেখ মুজিব দুনিয়াতে নেই এ খবর একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সামরিক কমান্ডাররা প্রতিরোধ পদক্ষেপ নেয়ার আগে অন্ততঃ দু'বার ভেবে দেখবে। কাজেই সে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চিন্তাই করেনি। তার পরিবর্তে ভয়ঙ্কর হত্যাকান্ডটি ঘটে যাবার পর সে রশিদকে তাদের সমর্থন লাভের জন্যে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রায় সবকটা ঘটনাতেই ফারুকের ধারণা আর সিদ্ধান্ত একেবারে কানায় কানায় সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। অভিযানে তার প্রধান লক্ষ্যসমূহ সঠিকভাবে অর্জিত হবার ব্যাপারে ফারুকের কোন সন্দেহই ছিলো না। তিনটি প্রধান বড় দলকে এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌছাতে বাধা সৃষ্টিকারী যে কোন কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার থাকবে। তার জানা ছিলো, সবাই ব্যর্থ হলেও তার ল্যান্সার এ ব্যাপারে ব্যর্থ হবে না।

সাধারণ অবস্থায় অতর্কিতে আক্রমণ চালানো হলে, ২৮টি ট্যাঙ্ক দিয়ে একসাথে জমাট বাধা ৩,০০০ রক্ষী বাহিনীর একটি দলকে অকেজো করে দেয়া তেমন কোন কঠিন কাজই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফারুকের ট্যাঙ্কগুলো ছিলো একেবারে শূন্য কান গোলা ছিলো না এতে। এমনকি ট্যাঙ্কের মেশিনগানগুলোতেও কোন গুলি ছিলো না। ঐ অবস্থায় কেউ তাকে সত্যিকারভাবে প্রতিরোধ করতে চাইলে, তার কিছুই করার থাকতো না। পরে জানানো হয়েছিলো যে, ট্যাঙ্কের সকল গোলাবারুদ জয়দেবপুরের অর্ডিন্যান্স ডিপোতে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। শেখ মুজিব প্রথম দিকে মিশরের এই ট্যাঙ্ক উপহার গ্রহণ করতেই রাজী ছিলেন না। তিনি প্রকৃত পক্ষে ঐ ব্যবস্থা করে এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যেন এসব ট্যাঙ্ক কোন কালেই অন্ততঃ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু ফারুক নিলো ভিন্ন পথ। সে ট্যাঙ্কগুলো দিয়ে সবাইকে ধোঁকা দিয়ে কাজ হাসিল করার পথ অবলম্বন করলো।

ফারুক পরে জানিয়েছিলো, 'মনস্তাত্বিক অস্ত্র হিসেবে ট্যাঙ্ক যে কতটা কার্যকরি তা খুব কম লোকই জানে। ট্যাঙ্ক দেখে জীবনের ভয়ে পালাবার চেষ্টা করবে না, এমন সাহসী লোক খুবই কম পাওয়া যাবে। আমরা জানতাম আমাদের ট্যাঙ্কগুলো নিরস্ত্র। জেনারেল হেড কোয়ার্টারের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র এ ব্যাপারে অবগত ছিলো। কিন্তু তারাও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলো না যে, ট্যাঙ্কগুলো আসলেই এতটা নিরস্ত্র। সংশ্লিষ্ট বাকী সবার কাছেই ট্যাঙ্ক অত্যন্ত মারাত্মক অস্ত্র যা তার সামনে যা কিছু আসে সবই উড়িয়ে দিতে পারে। ফারুক হাসতে হাসতে আরও বললো, 'কে-ই বা আমাকে অতটা পাগল ভাববে যে,

আমি পি এইচ কিউ আর রক্ষী বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্যে একবারে ফাঁকা কয়েকটা ট্যাঙ্ক নিয়ে এত বড় ভয়ঙ্কর অভিযানে পা বাড়াবো।'

ভোর ৪টা ৪০ মিনিট নাগাদ ফারুকের বাহিনী আঘাতের জন্যে সংগঠিত হয়ে গেলো এবং যার যার জায়গামত পৌঁছার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। রশিদের আর্টিলারী বাহিনী

তাদের কামান নিয়ে নতুন এয়ারপোর্টের প্রান্তে দাঁড়িয়ে। ল্যান্সার গ্যারেজে সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে ২৮টি ট্যাঙ্ক, ১২টি ট্রাক, ৩টি জীপ আর একটি ১০৫ মিঃ মিঃ হাউইটজার। এইগুলোর সঙ্গে রয়েছে রণসাজে সজ্জিত ৭০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল। এদের দুই-তৃতীয়াংশেরই ছিলো কালো উর্দি যা পরবর্তীতে বাংলাদেশীদের মনে এক ভয়ঙ্কর পোশাক বলে পরিগণিত হতে থাকে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, এই বিরাট সমরসজ্জা সেনা সদরের ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের দিন-রাত সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা। ল্যান্সার গ্যারেজের তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা সীমানার বাইরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগে থেকেই ফারুক সৈন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছিলো। নির্দেশ ছিলো গ্যারেজের ভেতরে সাজসজ্জার ব্যাপারে কেউ খোঁজ খবর নেয়ার চেষ্টা করলে, তাকে আটক করতে হবে। কিন্তু কেউ খোঁজ খবর করতে আসেনি। সম্ভবতঃ তারা ধরে নিয়েছিলো যে, ট্যাঙ্ক আর আর্টিলারির নির্ধারিত নৈশকালীন প্রশিক্ষণ মহড়ার কাজ চলছে।

আধ ঘন্টার মধ্যেই ফারুক তার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। ফারুক ছিলো সবার আগের ট্যাঙ্কটিতে। বাইরে বেরিয়ে আসতেই ফারুকের কানে ভেসে এলো আযানের ধ্বনি।

ক্যান্টনমেন্ট মসজিদ থেকে মোয়াজ্জিন ফজরের আযান দিচ্ছিলো। আজানের সময় ছুটে চলেছে মুসলমান হত্যাযজ্ঞের দিকে!

শুক্রবার ফজরের আযানের সময়েই ফারুক দুনিয়াতে জন্ম নিয়েছিলো। আজও আবার ফিরে এসেছে আর এক শুক্রবার। আযানের আওয়াজ তার কানে ঐ জন্মদিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো। হয় সে নবজীবনের সূচনা করবে, আর না হয় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

মনে হয়ে গেলো তার আন্ধা হাফিজের কথা। আন্ধা হাফিজ নির্দেশিত সুরা দু'টি মনে প্রাণে আর একবার পাঠ করে নিলো। সে তার ঘাতক বাহিনীকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিলো। শুরু হলো ভয়ঙ্কর মিশনের অশুভ যাত্রা।

গন্তব্যের পথে ফারুক ক্যান্টনমেন্টের গোলা-বারুদ সাব-ডিপোতে থামলো। তার ধারণা হচ্ছিলো যে, সে সেখানে সামান্য কিছু ট্যাঙ্কের গোলাবারুদ অথবা নিজের জন্যে মেশিনগানের কিছু বুলেট অবশ্যই পেয়ে যাবে। ঐ প্রত্যাশা নিয়ে চট করে সে ডিপোর ভেতরে ঢুকে পড়লো। কামানের ব্যারেলের ধাক্কায় ডিপোর দরজা খুলে ফেললো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে কোন গোলা বারুদ বা মেশিনগানের বুলেট ইত্যাদি কিছু ছিলো না। তার কাছে ব্যবহার করার মতো একটা ষ্টেনগান ছাড়া আর কোন অস্ত্রই ছিলো না। সুতরাং ধোঁকা দিয়ে কাজ সিদ্ধি করা ছাড়া আর কোন গতি রইলো না।

বনানীর রাস্তা ধরে, ডানদিকে মোড় নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের চেক পয়েন্টের দিকে ফারুকের ট্যাঙ্ক বহর ধীরে ধীরে ছুটে চললো। পথে ছিলো চতুর্থ ও প্রথম বেঙ্গল পদাতিক বাহিনীর সৈনিক। ঐ সময়ে তারা প্রাতঃকালীন পিটি-তে বেরিয়েছিলো। তারা সবাই তাদের ড্রিল বন্ধ করে ট্যাঙ্ক বহরকে হাত উঠিয়ে শুভেচ্ছা জানালো। ফারুকের সৈন্যরাও স্বতঃস্ফুর্তভাবে হাত নেড়ে উঁচিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলো। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ট্যাঙ্কের অতবড় বহর তাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে যেতে দেখেও কারো মনে কোন সন্দেহ জাগলো না। একমাত্র ফারুকের বাবা ডাঃ রহমান ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। তিনি সবেমাত্র ফজরের নামাজ শেষ করেছেন। আওয়াজ শুনে তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন ট্যাঙ্ক বহর এগিয়ে যাচ্ছে। এতো ভোরে ট্যাঙ্ক বাইরে আসার ব্যাপারটি তার কাছে বেখাপ্পা ঠেকছিলো। তিনি অবাক হয়ে এগুলোর গতিবিধি নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে বের হয়েই ট্যাঙ্কগুলো দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো। দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়লো এয়ারপোর্ট এলাকায়। একটা ট্যাঙ্ক পূর্বের নির্দেশ মতো সারি থেকে বেরিয়ে এসে রানওয়ে অবরোধ করে বসলো। আর একটি গেলো হেলিপ্যাডের দিকে। সেখানে আধ ডজন হেলিকপ্টার পার্ক করা ছিলো। বাকী সব ট্যাঙ্ক প্ল্যান্ট প্রটেকশন সেন্টারকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চললো রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের দিকে। ফারুক তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল ৫টা ১৫মিনিট হয়ে গেছে। ততক্ষণে ঘাতকদলগুলো তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।

এয়ারপোর্টের দেয়ালের কাছাকাছি এসে ফারুখ তাকিয়ে দেখে মাত্র একটি ট্যাঙ্ক তাকে অনুসরণ করছে। বাকী ২৪টা ট্যাঙ্ক একবারে লাপাত্তা। কিন্তু ফারুক দমে যাবার পাত্র নয়। কম্পাউন্ডের বাউন্ডারী ওয়াল আর দুটি গাছ উপড়ে ফেলে তার ট্যাঙ্ক এগিয়ে চললো। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর ব্যারাকের কাছে সে যা দেখলো তাতে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

ট্রাকের ড্রাইভার তাকে বললো, 'এখন আমি কি করব?'

'সে তাকে বললাম তুমি তাদের নাকের ডগার মাত্র ছইঞ্চি দূর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে।' কামানগুলো তাদের মাথা বরাবর তাক করে রাখার জন্যে গানারদেরকে নির্দেশ দিল।

অন্যান্যদেরকে ভাবভঙ্গিতে সাহসী ভাবটা ফুটিয়ে রাখতে বলে দিল।

ওরা যখন ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, তখন রক্ষীবাহিনীর লোকেরা অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। তারা তাদের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে ছিল। সে ছিলো এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। সে ড্রাইভারকে বললে, যদি ওরা কিছু করতে শুরু করে, অমনি আর দেরি না করে তাদের উপরেই ট্যাঙ্ক চালিয়ে দেবে।'

'তার আর দরকার হয়নি। দূর থেকে ভেসে আসা গুলির আওয়াজ তাদের কানে বাজতে লাগলো। তাছাড়া নিজেদের সামনে হঠাৎ করে ট্যাঙ্ক দেখে, ওরা গায়ের মশা পর্যন্ত নাড়াবার সাহস পেল না।'

রক্ষীবাহিনীর কাছ থেকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া না দেখে ফারুক নিশ্চিত হলো যে, তার বিপদের সম্ভাবনা কেটে গেছে। তার ধারণা আরও একবার পুরোপুরি সঠিক প্রমাণিত হলো। ফারুক পরিপূর্ণভাবে আশান্বিত হলো যে, তার বিজয় সুনিশ্চিত- সে বিজয়ী। ঐ অবস্থায় রক্ষীবাহিনীকে পাহারা দেয়ার জন্যে একটা রেখে অন্য ট্যাঙ্কটি নিয়ে ফারুক ধানমন্ডির দিকে রওয়ানা দিলো।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির অবস্থা তখন গোলযোগপূর্ণ। ভোর সোয়া পাঁচটার মধ্যেই মহিউদ্দিন, নুর আর হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত প্রধান ঘাতক দলটি শেখ মুজিবের বাড়িতে পৌছে গিয়েছিলো। তাদের সঙ্গে পাঁচ ট্রাক ভর্তি ১২০ জন সৈন্য আর একটি হাউইটজার ছিলো। মীরপুর রোডে লেকের পাড়ে হাউইটজারটি শেখ মুজিবের বাড়ির মুখোমুখি বসানো হলো। আরও কিছু ট্রাকে করে সৈন্য এসে পুরো বাড়িটার চতুদিক ঘিরে ফেলে তারপরই মেজররা আর তাদের লোকের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

বাড়ির এলাকার বাইরে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ কালো উর্দিপরা ভারি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য দেখে ভড়কে যায় এবং কোন প্রকার বাদানুবাদ ছাড়াই আত্মসমপূর্ণ করে। গেটে প্রহরারত ল্যান্সার প্রহরীরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলো না ঠিকই। কিন্তু তারা ঐ কালো উর্দি পরিহিত লোকদেরকে ভেতরে আসার সুবিধে করে গেট ছেড়ে দিলো। ঐ সময় শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত প্রহরীরা বারান্দায় ঘুমন্ত ছিলো। আনাগোনার শব্দ শুনে ওরা জেগে উঠে। গেট দিয়ে অচেনা লোকদেরকে অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে দেখে, তারা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি চালায়। আর্টিলারীর শামসুল আলমের মাথায় গুলি লেগে সঙ্গে সঙ্গেই সে মারা যায়। ল্যান্সার বাহিনীর আর একজন সৈন্য গুরুতর ভাবে আহত হয়। সঙ্গীদের ঢলে পড়তে দেখে আর বাড়ির ভেতর থেকে প্রচন্ড প্রতিরোধের কারণে সৈন্যেরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেখ মুজিবের দেহরক্ষীদের হত্যা করে তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই তারা নিচতলার প্রতিটি রুম পালাক্রমে তল্লাশি করে দেখে।

ইতিমধ্যে প্রচন্ড গুলি বিনিময়ের শব্দে হাউইটজার ক্রুরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রবল প্রতিরোধের আশঙ্কায় তারা তাদের হাউইটজার থেকে রকেট নিক্ষেপ করতে শুরু করে। রকেটে প্রথম দুটিই ধানমন্ডির লেকের দু'পাশে গিয়ে পড়ে। তারপর তারা তাদের কামান উঁচিয়ে আরও ছয় রাউন্ড রকেট নিক্ষেপ করে। একটিও লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হলো

না। কামান থেকে এতবেশি জোরে রকেটগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো যে, এর একটা প্রায় চারমাইল দূরে মোহাম্মদপুরে এক বিহারীর বাড়িতে গিয়ে পড়ে। ঐ রকেটের আচমকা আঘাতে দু'ব্যক্তি নিহত ও অনেক লোক আহত হয়।

শেখ মুজিব নিজেও খুব তাড়াতাড়ি কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টা চালান। প্রথমেই তিনি টেলিফোন করেন রক্ষী বাহিনীর সদর দফতরে। সেদিন রক্ষীবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান আর কর্ণেল সাবিহউদ্দিন দেশে ছিলো না। তিনি বহু চেষ্টা করে অন্য কোন সিনিয়র অফিসারকেও মিলাতে পারলেন না। উপায় না পেয়ে তিনি সেনাবাহিনী ষ্টাফ প্রধান, জেনারেল শফিউল্লাহ্‌কে ফোন করেন এবং তার মিলিটারী সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হককে ফোন করে অবিলম্বে সাহায্য পাঠাবার নির্দেশ দেন। সর্বশেষে ফোনটি করেন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ডাইরেক্টর কর্ণেল জামিলকে। মাত্র দিন পনের আগে শেখ মুজিব কর্ণেল জামিলকে ঐ পদের জন্যে বিশেষভাবে নির্বাচন করেন। জামিল একটুও দেরি করলো না। পোশাক পরিধানের সময় না পেয়ে তার পায়জামার উপর ড্রেসিং গাউনটি চড়িয়ে দিয়ে লাল ফক্সওয়াগণ গাড়িতে করে সে প্রেসিডেন্টের সাহায্যে ছুটে চললো। প্রচন্ড বেগে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে পৌছালো প্রেসিডেন্টের বাড়ির দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি তখন কারবালায় পরিণত হয়ে গেছে। গেটের বাইরেই তাকে থামিয়ে দিলো সৈন্যরা। অত্যন্ত কড়া ভাষায় বাক্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই জামিল তার গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইলেই সৈন্যরা গুলি চালিয়ে দেয় জামিলের বুকে আর মাথায়। ঢলতে ঢলতে প্রেসিডেন্টের বাড়ির গেটের গোড়ায় মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়ে জামিল। জীবনের বিনিময়েও সে শেখ মুজিবের কোন কাজে লাগাতে পারলো না।

এরই মধ্যে বাড়ির সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে পড়েছে। মেজর মহিউদ্দিন, হুদা আর নুর বাড়ির প্রতিটি কামরা মুজিবের খোঁজে তন্ন তন্ন করে চষে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মহিউদ্দিন মুজিবকে পেয়ে গেলো। সে দু'তলায় উঠতে সিড়ির গোড়ায় পা ফেলতেই শেখ মুজিবকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পায়। তাদের মধ্যে দূরত্ব কুড়ি ফুটের বেশি হবে না। শেখ মুজিবের পরণে তখন একটি ধূসর বর্ণের চেক লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবী। ডান হাতে ছিলো তাঁর ধূমপানের পাইপটি।

শেখ মুজিবকে হত্যা করার দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ অভিযানে বেরুলেও মহিউদ্দিন শেখ-এর সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে পুরোপুরিভাবে মনোবল হারিয়ে ফেলে। মহিউদ্দিন আমতা আমতা করে তাঁকে বলছিলো, 'স্যার, আপনি আসুন।'

'তোমরা কি চাও?' মুজিব অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। 'তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? ভুলে যাও। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তা করতে পারেনি। তোমরা কি মনে করো, তা করতে পারবে?'

মুজিব স্পষ্টতঃই সময় কাটাতে চাচ্ছিলেন। তিনি তো আগেই বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করে রেখেছেন। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই লোকজন তাঁর সাহায্যে ছুটে আসছে। সেই সময়ে তিনি অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিচ্ছিলেন।

পরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে ফারুক বলছিলো, 'শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ছিলো অত্যন্ত প্রবল। মহিউদ্দিন তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে একেবারে নতজানু হয়ে পড়েছিলো। ঐ মুহূর্তে নুর চলে না আসলে কি যে ঘটতো তা আমার আন্দাজের বাইরে।'

'মহিউদ্দিন তখনো ঐ একই কথা বলে চলছিলো, "স্যার, আপনি আসুন।" আর অন্যদিকে শেখ মুজিব তাকে অত্যন্ত কড়া ভাষায় ধমকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নুর এসে পড়ে। তার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে বুঝে ফেলে, মুজিব সময় কাটাতে চাইছেন। মহিউদ্দিনকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নুর চিৎকার করে আবোল তাবোল বকতে বকতে তার ষ্টেনগান থেকে মুজিবের প্রতি ব্রাশ ফায়ার করে। শেখ মুজিব তাকে কিছু বলার আর সুযোগ পেলেন না। ষ্টেনগানের গুলি তাঁর বুকের ডান দিকে একটা বিরাট ছিদ্র করে বেরিয়ে গেলো। গুলির আঘাতে তাঁর দেহ কিছুটা পিছিয়ে গেলো। বাঙালী জাতীয়তাবাদের মহান নেতার প্রাণহীন দেহ মুখ থুবড়ে সিঁড়ির মাথায় গড়িয়ে গিয়ে থেমে রইলো। তাঁর ধূমপানের প্রিয় পাইপটি তখনও তিনি শক্তভাবে ডান হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন।

সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙালি জাতির সঙ্গে শেখ মুজিবের প্রচন্ড ভালবাসার চিরতরে অবসান ঘটলো।

গুলির শব্দ শুনে বেগম মুজিব তার স্বামীর অনুসরণ করতে চাইলে তার বেডরুমের দরজার সামনেই তাকে আর এক দফায় ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হলো। তারপর হত্যাযজ্ঞ চলতে লাগলো। অফিসার আর সৈন্যরা গুলি করে দরজার বোল্ট উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক রুমের দরজা খুলে ফেললো। তারপর ব্রাশ ফায়ার করে রুমগুলো ঝাঁঝরা করে দেয়া হলো যেন একটা প্রাণীও এর ভেতরে বেঁচে থাকতে না পারে। শেখ মুজিবের দ্বিতীয় ছেলে জামাল। কেবলই স্যান্ডহার্ষ্ট থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে সেনাবাহিনীতে কাজ করছিলো। অবস্থা দেখে বাড়ির বাকী সদস্যদের বাঁচানোর জন্যে সে তাদেরকে মেইন বেড রুমে এনে জমায়েত করে। এবার এলো তার মরার পালা। একজন অফিসার অত্যন্ত কাছ থেকে তাকে গুলি করলে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সামনে শেখ জামাল মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। নয় বছর পরও যেই দেয়ালের বিপরীত দিক থেকে তাকে গুলি করা হয়েছিল তার দাগ, হাড়ডি, আর মাংসের কনা, এমনকি বুলেটগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার প্রমাণ হিসেবে রয়ে গিয়েছিলো।

মুজিবের দুই যুবতী পুত্রবধূ, কামাল আর জামালের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীদ্বয়, রাসেলের গলা জড়িয়ে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। রাসেল শেখ মুজিবের দশ বছর বয়স্ক সর্বকনিষ্ঠ ছেলে। দুই পুত্রবধূকে জঘন্যভাবে টেনে আলাদা করে অত্যন্ত কাছে থেকে গুলি করে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। রাসেল তখন ঘরের আলনা কিংবা অন্যান্য আসবাব পত্রের আড়ালে পালিয়ে জীবন বাঁচানোর সকরুণ ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশুটিকেও ঠিক একইভাবে সজোরে টেনে বের করে অত্যন্ত জঘন্যভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলা হলো।

শেখ মুজিবের ছোট ভাই, শেখ নাসের। সে পাশের একটা বাথরুমে পালিয়ে ছিলো। সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়।

শেখ মুজিবের দুই কন্যার মধ্যে শেখ হাসিনা বয়সে বড়। ওরা দু'জনই দেশের বাইরে থাকায় এই ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ থেকে প্রাণে বাঁচে।

নির্মম খুনের নীরব দর্শক এই বাড়িটির কোন কিছুতেই হাত দেয়া হয় নি বলে, ভয়ঙ্কর ঘটনাটির প্রমাণাদি এতদিন ধরে যেন হিমায়িত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিলো।

হত্যাকারীরা এরপর পুরো বাড়িটা এক এক করে তল্লাশী চালায় এবং মূল্যবান সব কিছু লুটে নেয়। প্রতিটি আলমারী, ড্রয়ার ও অন্যান্য আসবাব ভেঙে খোলা হয়।

মূল্যবান জিনিসপত্র ছাড়া সব কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলা হয়। বাড়ির প্রতিটি কামরাই এক একটা কসাইখানা। আর সমস্তটা বাড়ি জুড়ে যেন মৃত্যুর গন্ধ দর্শনার্থীদের ব্যাকুল করে তোলে।

মৃত্যুর পরেও শেখ মুজিবকে আর একদফায় অবমাননা করা হলো। ফারুক জানিয়েছিলো, হত্যাকারীদের একজন জীবদ্দশায় শেখ মুজিবকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পায়নি। খুব কাছে থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্যে সে তার পায়ের বুট মুজিব দেহের নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর অত্যন্ত বর্বরোচিতভাবে বুটের হেঁচকা টানে প্রাণহীন মরদেহটি উল্টিয়ে দিয়ে মনের সুখে বঙ্গবন্ধুর হাসিমাখা মুখখানি দেখার সাধ মিটায়। এর প্রায় চার ঘন্টা পর সরকারী তথ্য দফতর থেকে আগত একজন বিশেষ ফটোগ্রাফার ঐ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর ছবি উঠায়।

শেখ মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি সেরনিয়াবাত আর শেখ মনি'র বাড়িও ঐ সময়ে হত্যাকারীদের ভিন্ন দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে গেছে।

ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে ডালিমের দল আবদুর রব সেনিয়াবাতের বাড়িতে পৌছে। সেখানে মাত্র একজন পুলিশ পাহারাদার ছিলো। সম্ভবতঃ তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে আক্রমণকারীরা গুলি চালায়। বন্দুকের গুলির আওয়াজে বাড়ির দিকে গুলি চালাতে দেখে

তার কাছে সব সময় যে ষ্টেনগানটা থাকতো, তা নিয়ে হাসনাত দৌড়ে চলে এলো দু'তলায়, তার বাবাকে জাগিয়ে দিতে। আবদুর রব সেরনিয়াবাত তখন শেখ মুজিবকে সাহায্য পাঠানোর জন্যে টেলিফোন করতে ব্যস্ত। লাইন পাচ্ছিলো না। আবারও চেষ্টা করে লাইন পাওয়া গেলো।

হাসনাত স্মৃতিচারণ করে বললো, বাবা বঙ্গবন্ধুকে বললেন আমাদের বাড়ি দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক আক্রান্ত। বাবা তাঁকে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে কেউ খুব চিৎকার করে কথা বলছে শুনে বাবা একবারে ভেঙে পড়লেন। আমার ধারণা বাবাকে বলা হয়েছিলো যে, বঙ্গবন্ধুর বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে। বাবা আর একটি কথাও বললেন না। তিনি ফোন নামিয়ে বিছানার উপর বসে পড়লেন। তারপর কোন কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

হাসনাত উঠে একটা জানালায় গিয়ে সৈন্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। 'গুলির ম্যাগাজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ট্রিগার চেপে রাখলাম। গুলি শেষ হয়ে গেলে আমি আরও গুলির জন্যে উপরতলায় দৌড়ে যাই।' হাসনাত বলছিলো। এতেই সে বেঁচে গিয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যেরা বেডরুমে ঢুকে পড়ে এবং সেরনিয়াবাতকে বসা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে। তারপর তারা বাড়ির সবাইকে ধরে নিয়ে নিচতলায় ডইং রুমে জড়ো করে।

ইতিমধ্যে হাসনাত উপরতলায় তার ষ্টেনগানের জন্যে রাখা অতিরিক্ত গুলির ম্যাগাজিন বের করার জন্য ট্রাঙ্ক ভাঙার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। তালা ভাঙার প্রচেষ্টা চলাকালে সে গুলির আওয়াজ এবং উপর তলায় এগিয়ে আসছে এমন সৈনিকের বুটের আওয়াজ শুনতে পায়। সে তখন তার গুলিহীন ষ্টেনগান মেঝেতে রেখে ছাদের উপর দিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সে লাফ দিয়ে চিলে কোঠার মেঝেতে বসে পড়ে। সৈন্যদের আসার অপেক্ষা করতে থাকে। নিশ্চয়ই এখন তার মরার পালা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কেউ এদিকে এলো না।

কুড়ি মিনিট ধরে সে থেমে থেমে গুলির আওয়াজ আর চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো আর সৈন্যদের বুটের আওয়াজ দূরে রাস্তায় মিলিয়ে গেলো। বাড়ির সবকিছু থেমে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করছিলো। তারপর অনেক সন্তর্পণে হাসনাত নেমে এলো নিচতলায়। ড্রইং রুমে এসে দেখে তা এক কসাইখানায় পরিণত হয়ে গেছে। চতুর্দিকে কেবল রক্ত, মৃত দেহের স্তূপ আর ভাঙা চোরা আসবাবপত্র। তার স্ত্রী, মা আর বিশ বছরের একটি বোন গুরুতরভাবে আহত। তার দুই কন্যা অক্ষত অবস্থায় সোফার পেছনে পালিয়ে থেকে ভয়ে কাঁপছিলো। আর তার পাঁচ

বছরের ছেলে, দশ ও পনের বছরের দুটি বোন, ১১ বছর বয়সী তার ছোট ভাই, আয়া, কাজের ছেলে আর তার চাচাতো ভাই শহিদুল ইসলাম সেরনিয়াবাত-এর লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। শহিদুল ইসলামের বড় বড় গোঁফ ছিলো এবং দেখতে অনেকটা হাসনাতের মত ছিলো। সেই কারণেই হয়তো হত্যাকারীরা হাসনাত ভেবে শহিদুল ইসলামকে গুলি করে হত্যা করে গেছে। শেখ মুজিবের ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষে হাসনাতের যে দশজন বন্ধু বরিশাল থেকে এসেছিলো তাদের মধ্যে একজন নিহত আর পাঁচজন আহত হয়। পরে হাসনাত বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।

শেখ মনির বাড়িতে আক্রমণটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও রীতিমত প্রলয়ঙ্করী গোছের। শেখ মনির ঘুম অত্যন্ত পাতলা বলে প্রতীয়মান হয়। রিসালদার মোসলেহউদ্দিন দুই ট্রাক ভর্তি তার লোকজন নিয়ে মনির বাড়ির দিকে এলেই সে ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে একেবারে বিছানায় বসে পড়ে। সৈন্যদেরকে দেখে সে জিজ্ঞেস করলো তারা তার বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে এসেছে কি না। মোসলেহউদ্দিন তাকে নিচে নেমে আসতে অনুরোধ করে। মনি নিচে নেমে আসে। আসার সঙ্গে সঙ্গে মনিকে সে ধরে ফেলার চেষ্টা করে। ঐ মুহূর্তে মনির সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আর অমনি ষ্টেনগান দিয়ে গুলি করে উভয়কে চিরশয়নে শায়িত করা হয়। বাড়ির আর একটা লোককেও স্পর্শ করা হলো না। মোসলেহ উদ্দিনের জন্য নির্দিষ্ট মিশন সম্পন্ন করে সে শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলো।

পবিত্র জুমার দিন।

মুসলমান হত্যা করলো মুসলমানকে।

মানুষের স্বার্থে বলি হলো মানুষ।

মানুষের রক্তে ভিজে গেল পৃথিবীর বুক।

আবার।

কাকতালীয় ভাবে দুনিয়ার নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটেছে পবিত্র জুমার দিন। লিংকন, কেনেডি, লিয়াকত আলী। আরও অনেকে।

প্রকৃতির রহস্য বোঝা ভার।

আর আশ্চর্য! ঠিক আরেক জুমার দিন চলছে হত্যার ষড়যন্ত্র। [illegible] জিয়া।

জুম্মা নামাজ শেষে মঞ্জুর তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী [illegible] লেঃ কর্ণেল মাহবুব, লেঃ দেলোয়ার আর মেজর [illegible] সদস্য, লেঃ কর্ণেল মতি বিশেষ কাজে রাঙ্গামাটি যাওয়ায় [illegible]। মঞ্জুর তার অনুপস্থিতিতে কিছুটা রাগান্বিত হয়ে উঠে এবং বারবার তার অনুপস্থিতির ব্যাপারে জানতে চাইছিলো। মতি খুব শিগগীর ফিরে আসবে বলে জানানো হয়। নির্দেশব্যঞ্জক

সুরে উপস্থিত সহযোগীদের মঞ্জুর বলেন, 'এখনই কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। কিভাবে করবে, কি দিয়ে করবে, তা আমি জানি না। কোন সৈন্য সামন্ত কাজে লাগানো যাবে না। তোমাদের নির্দিষ্ট কয়েকজন সার্কিট হাউজে গিয়ে জিয়াকে উঠিয়ে আনবে। সকালে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো এবং দুর্বল পয়েন্টগুলো পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

এইভাবেই প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর আদেশ ঘোষিত হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেনারেল জিয়ার ইহজগতের শেষ দিনটি ছিলো একেবারে সাদামাটা। বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে জেনারেল জিয়া, নৌ-বাহিনী প্রধান, রিয়ার এডমিরাল এম, এ খান এবং বিএনপি'র কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য নিয়ে ঢাকা থেকে পতেঙ্গা এসে পৌছায়। বিএনপি নেতাদের মধ্যে ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সৈয়দ মহিবুল হাসান, ডঃ আমিনা রহমান, ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা এবং রাজ্জাক চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। বিমান বন্দরে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন, নগরীর পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ঔপনিবেশিক কায়দায় নির্মিত চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে পৌঁছুলে জেনারেল জিয়াকে কিছু হালকা নাশতা পরিবেশন করা হয়। নিরাপত্তা নিয়ম অনুযায়ী তাঁর নাশতা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক লেঃ কর্ণেল মাহতাবুল ইসলাম খেয়ে পরীক্ষা করে এবং তারপর তাঁকে তা খেতে দেয়া হয়।

জেনারেল জিয়া প্রায় দু'ঘন্টা ধরে সার্কিট হাউজের বারান্দায় বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালান। বেলা সাড়ে বারোটার দিকে জুম্মার নামাজের জন্যে আলোচনা বন্ধ রাখা হয়। জিয়া পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে চকবাজারের চন্দনপুরা মসজিদে জুম্মা নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে উপস্থিত মুসল্লি ও জনগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটিয়ে সার্কিট হাউজে ফিরে যান। এখানে তিনি দলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান। তার খাবারের তালিকা ছিলো খুবই সাধারণ গোছের। কারণ, তিনি কখনো তৈলাক্ত ও বেশি মশলাযুক্ত খাবার পছন্দ করতেন না। খাবার শেষে তিনি ঘন্টা দেড়েক বিশ্রাম নেন। বিকেল ৫টায় উঠে চা পান করে তিনি নিচতলার বৈঠক খানায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর জন্যে ৪৫ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি অপেক্ষা করছিলেন। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও কয়েকজন অধ্যাপক, বারের কিছু সদস্য, শহরের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ লোক এবং কয়েকজন সাংবাদিক। তাদের সঙ্গে জিয়া প্রায় আড়াই ঘন্টা কথাবার্তা বলেন। তারপর তিনি তার আসল কাজে মনোনিবেশ করেন। স্থানীয় বিএনপি'র দুই বিবাদমান অংশের বিরোধ নিরসনের জন্যে তিনি আলাদা আলাদাভাবে তাদের সঙ্গে রাত ৯টা থেকে ১১টা

পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যান। এর মাঝে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনার সাইফুদ্দিন আহমেদ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাদিউজ্জামানের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা জানায়, অন্ততঃ ৪০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা চলছে। তাদের কেউ বেআইনী জমি দখল, বেআইনী অস্ত্র বহন, আবার কেউ বা শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এদের সকলেই বিএনপি'র সদস্য বিধায় পুলিশ তাদের ধরতে চেয়েও থমকে দাঁড়াচ্ছে বলে তারা প্রেসিডেন্টকে জানান। জিয়া তাদেরকে তাঁর দল থেকে সরিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ডাক্তার তাঁর খাবার পরখ করা শেষ করলে, রাত ১১টার একটু পরে তাঁকে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। জীবনের শেষ খাবার খেয়ে জিয়া তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় টেলিফোনে কথা বলেন। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের শেষ কথোপকথন ১৫ মিনিট স্থায়ী হয়। জীবনের সব কাজ সাঙ্গ করে মধ্যরাতের খানিক পরে, জিয়া তাঁর জীবনের শেষ যামিনী যাপনের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবন বাতি নিভে যাবার মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে জিয়া তাঁর নিজ হাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘুমুতে গেলেন। বাইরে তখন তুমুল ঝড় আর বিদ্যুতের ঝল্কানি। এর আগে অবশ্য তিনি সকাল পৌনে সাতটায় তাঁকে চা পরিবেশন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিশ্চিন্তে তিনি শুয়ে পড়লেন বিছানায়। অথচ, ঠিক সেই মুহূর্তেই জিয়াকে চিরদ্রিায় শায়িত করার উদ্দেশে চট্টলার ক্যান্টনমেন্টে ঘাতকের দল প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জেনারেল মঞ্জুরের সঙ্কেত পেয়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যেরা লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার হোসেনের বাসভবনে 'অভিযান' তৈরি করার জন্যে মিলিত হন। তখন বিকেল ৬টা। লেঃ কর্ণেল মতি ও রাঙ্গামাটি থেকে ফিরে এসেছে। উপস্থিত অন্যান্যরা হচ্ছে, লেঃ কর্ণেল মাহবুব, লেঃ কর্ণেল ফজলে হুসেন, মেজর খালিদ, মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী এবং মেজর রওশন আয়াজদানী ভূঞা। লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেনের মতে, তখন তারা দু'টি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে। প্রথমটি হচ্ছে, সার্কিট হাউজে থেকে জেনারেল জিয়াকে উঠিয়ে আনা। তাঁকে ব্যবহার করে ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তার, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের এখানে এনে তাদেরকে হত্যা করা। বিকল্প হচ্ছে, যদি ঐটি ব্যর্থ হয়, তাহলে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করা হবে। মতি, মাহবুব এবং খালিদ জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার চাইতে জিম্মি করার পক্ষপাতি ছিলো। কারণ এতে তারা তাদের কাজের জন্যে জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হতে পারতো।

ভিন্ন ভিন্ন ঘাতক দলের নেতাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। ১১২ সিগন্যাল কোম্পানীর কমান্ডিং অফিসার মেজর মারুফ পরে এলে, তাকে পরদিন ভোরবেলা নাগাদ ঢাকার সঙ্গে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ষড়যন্ত্রকারী দল আগে থেকেই সার্কিট হাউজের ভেতর থেকে

সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। দিনের বেলা মতি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রেসিডেন্টের প্রধান ষ্টাফ অফিসার লেঃ কর্ণেল মাহফুজের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সে তাকে জানায় যে, তারা আজ রাতেই প্রেসিডেন্টের জীবনের উপর হামলা চালাবে। তার পরিবর্তে মাহফুজও সম্ভব সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করে। নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষে যে দু'জন গার্ড থাকে, মাহফুজ তাদের সরিয়ে দেয়। তাছাড়া, সে সরকারী প্রটোকল অফিসারের কাছ থেকে সার্কিট হাউজের কক্ষ বন্টনের চার্টও সংগ্রহ করে এবং দিনের বেলায় ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের মেজর মুজিবুর রহমান এলে, তার মাধ্যমে চার্টটি 'হানাদার বাহিনীর' কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জেনারেল মঞ্জুর আগে থেকেই কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যেন, একাজে কোন সৈন্য ব্যবহার না করা হয়। মঞ্জুরের এ নির্দেশ সত্ত্বেও আঘাত হানার জন্যে সৈন্য যোগাড় করতে মেজর খালিদকে বলা হয়। সে তখন ব্রিগেড মেজর। কিন্তু তারপরেও সৈন্য যোগাড় করা তার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে পড়ে। রাত প্রায় ৯টায় সে ফার্স্ট ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার আবুল হাশিমকে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দেয়, তাকে ঐ রাতেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে এগিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সৈন্যদের বহন করার জন্যে ট্রাক ভাড়া করার কাজে ব্যবহার করতে বলে। সুবেদার হাশিম সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে। টাকা নিতে অস্বীকার করে। সে খালিদকে জিজ্ঞেস করে, 'আমি সৈনিকদের এ টাকার ব্যাপারে কি বলবো? খালিদ বললো, 'তোমার যা খুশি একটা বলে দিও--কিংবা বলে দিও যে, প্যারেডের সময়ে সিনেমা দেখার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে এখন কালুরঘাট যেতে হচ্ছে।' এতে সুবেদার হাশিম আরো বেশি সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠে। খালিদ তার উপর চটে গেলে, হাশিম এমনভাবে বেরিয়ে যায় যেন সে মেজরের হুকুম তামিল করার জন্যেই ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু সে তার সৈন্যদের যার যার জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে সোজা তার বাসায় গিয়ে পালিয়ে থাকে।

আধ ঘন্টা পরে মেজর খালিদ ৬৯, পদাতিক ব্রিগেডের মেজর মোহাম্মদ মোস্তফাকে কিছু সৈন্য সরবরাহের জন্যে অনুরোধ জানায়। মেজর মোস্তফা ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন আহমদ-এর কানে তুলে এবং বলে, 'মেজর খালিদ সার্কিট থেকে প্রেসিডেন্টকে উঠিয়ে আনার জন্যে ফার্ষ্ট ইষ্ট বেঙ্গলের কিছু ট্রুপ চাচ্ছে।' ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন বলে, 'খালিদ পাগল হয়েছে নাকি? এক্ষণই তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।' ব্রিগেডিয়ার একজন সৈনিককেও ব্যারাক থেকে বেরুতে মানা করে। পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে ব্রিগেডিয়ার মোহসিনউদ্দিন জানায়, সে জিওসি, জেনারেল মঞ্জুরকে তখন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা স্টাফ কিংবা গোয়েন্দা সংস্থাকে না জানিয়েই চুপচাপ বসে থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারে যে, একাজের জন্যে কোন সৈন্যই তারা পাচ্ছে না। আঘাত হানার জন্যে তাদেরকে সম্পূর্ণভাবেই অফিসারদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। রাত দশটার দিকে লেঃ কর্ণেল মাহবুব দু'জন অফিসারকে সার্কিট হাউজে পাঠিয়ে সেখানে কোন অস্বাভাবিক গতিবিধি চলছে কিনা তা রিপোর্ট করতে বলে। মেজর শওকত আলী এবং মেজর লতিফুল আলম চৌধুরী চট্টগ্রাম ক্লাবের দেয়ালে তাদের সশস্ত্র অবস্থান নেয়। সেখান থেকে সার্কিট হাউজ পরিষ্কার দেখা যায়। অভিযান পরিপূর্ণভাবে শেষ না হাওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করে।

রাত গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা সব কাজ তড়িঘড়ি করে সেরে নিতে সচেষ্ট হয়। রাত সাড়ে এগারোটায় মতি আর মাহবুব ২৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের অফিসে ১১ এবং ২৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল অফিসারকে ডাকা হয়। তাদের মধ্যে ৬ জন সেখানে উপস্থিত হয়। তারা হচ্ছে- মেজর মোমিন, মেজর গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মুনির, ক্যাপ্টেন জামিল, ক্যাপ্টেন মইনুল এবং ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। মতি দরজা তালাবদ্ধ করে একখানা পবিত্র কোরআন নিয়ে আসে। সে সমবেত অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলে, 'ভদ্রমন্ডলী, এইটি একখানা পবিত্র কোরআন। আমরা যা কিছুই করতে যাচ্ছি, সবই আমাদের দেশ, জাতি আর ন্যায় বিচারের স্বার্থে করতে হচ্ছে। আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে আছেন, এই পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতে হবে যে, এ জন্যে যা কিছু করণীয় সবই আপনারা করতে রাজী আছেন। যারা আমাদের সঙ্গে থাকতে নারাজ, তারা রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। তবে, তাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, আপনারা অন্য কারো কাছে এ কথাটি দয়া করে জানাবেন না।'

কেউ এতে নারাজ হয় নি। সকলেই একে একে শপথ গ্রহণ করে নেয়। তারপর, অস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে তারা সকলেই সমরসাজে সজ্জিত হয়। তাদের সঙ্গে ছিলো সাব-মেশিনগান (এসএমজি)। আর প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ।

৬ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন ও তার হেড কোয়ার্টারে একই নাটকের অবতারণা করে। ফজলে লেঃ রফিকুল হাসান খানকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমি যেখানে যেতে চাচ্ছি, তুমি কি আমার সঙ্গে সেখানে যাবে?' রফিকুল জবাব দেয়, 'স্যার, আপনার নির্দেশ পেলে অবশ্যই যাবো।' তারপর ফজলে লাইনের অন্যান্য অফিসারদের ডেকে পাঠায়। তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন আরেফীন এবং লেঃ মোসলেহউদ্দিন। ফজলে উপস্থিত অফিসারদের উদ্দেশে বলে ' তোমরা জানো, দেশের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীকে বহুলাংশে দূর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আজ

এবং কাল দু'দিন প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন। এ ব্যাপারে এরই মধ্যে আমাদের কিছু একটা করে নিতে হবে। আমরা মনস্থ করেছি, আজই আমরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেতে রাজী আছি?' একবাক্যে সকলেই রাজী হয়ে গেলো। 'আমাদের মিশন পুরোপুরিভাবে স্বার্থক/সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারবে না।' মতি বললো।

৩০ শে মে, রাত্র আড়াইটার দিকে'ঘাতকদল' কালুরঘাটস্থ রেডিও ট্রান্সমিটারের কাছাকাছি তাদের নির্ধারিত মিলনস্থলে এসে হাজির হতে থাকে। এই সেই জায়গা যেখান থেকে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে জেনারেল জিয়া খ্যাতির সিঁড়িতে পা রাখেন। তখন বিজলী, বজ্রপাতসহ প্রচন্ড বেগে বাতাস বইছিলো আর মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিলো। তিনজন সঙ্গী নিয়ে লেঃ কর্ণেল মাহবুব তার সাদা টয়োটা গাড়িতে চড়ে আসে। একঘন্টার মধ্যেই সেখানে ১৮ জন অফিসার আর দু'জন জেসিও এসে জড়ো হয়। ঐ সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ফার্স্ট ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর খালিদ তাদের উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলে তারা তাদের সঙ্গে যোগ দিতে জোর গলায় অস্বীকার করে। তাদেরকে পরে লেঃ মতিউর রহমানের অধীনে কালুরঘাট ব্রীজের অপর পাড়ে বান্দরবান সড়কে রেখে আসার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

বিদ্রোহে যোগদানের ব্যাপারে সাধারণ সৈনিকদের অস্বীকৃতি জিয়া হত্যা ঘটনার একটি অসাধারণ দিক।

সৈনিকদের নৈশকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা থাকায় সশস্ত্র লোকদের ক্যান্টনমেন্টের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটি কারো চোখে পড়েনি। তাছাড়া, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ঐ সময়ে যথেষ্ট শিথিল ছিলো। চট্টগ্রামের স্থানীয় নিরাপত্তা ইউনিট তৎপর না থাকায় ব্যাপারটি সময় মতো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসতে পারেনি। ঐ সময়েও জিয়ার ভাগ্য তাঁর বিপরীতে কাজ করছিলো।

ঘাতক দলের নেতৃত্ব দেয় লেঃ কর্ণেল মতিউর রহমান। তাদের সঙ্গে ছিলো ১১টি এসএমজি, তিনটি রকেট ল্যান্সার, এবং তিনটি গ্রেনেড ফায়ারিং রাইফেল। সে ঐ সবগুলো অস্ত্রে সঠিকভাবে গোলাবারুদ ভর্তি করা হয়েছে কিনা এবং সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, পরীক্ষা নেয়। ১৬ জন অফিসারকে একটি পিকআপে গাদাগাদি করে উঠানো হয়। সার্কিট হাউজ এবং থাকার ঘরের একটি নকশা দেখিয়ে মতি তাদেরকে পুরো অভিযান পরিকল্পনাটি বুঝিয়ে দেয়। তারপর সে একখানা পবিত্র কোরআন দিয়ে তাদের সকলের শপথ নবায়ন করে নিয়ে সজোরে ঘোষণা করে, 'আমরা আজ প্রেসিডেন্টকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছি।'

ঘাতক বাহিনী তিনটা দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ চালানোর কথা। পরিকল্পনা মত, দু'টি দল সার্কিট হাউজে ঢুকে আক্রমণ পরিচালনা করবে এবং একটি দল সার্কিট হাউজের পিছনে আলমাস সিনেমা হলের কাছে অবস্থান নেবে। কেউ যদি সার্কিট হাউজ থেকে পালাতে চেষ্টা করে তবে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। প্রথম দলে কে কে থাকতে ইচ্ছুক জিজ্ঞেস করা হলে অনেকেই এতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু মতি তাদের মধ্যে থেকে মাত্র ছ'জনকে বাছাই করে নেয়। এই ছ'জন মাহবুব, ফজলে, খালিদ, জামিল, হক, আবদুস সাত্তার আর লেঃ রফিকুল হাসান খান। ফজলে এ দলের নেতৃত্ব দেবে আর গাড়ি চালাবে মাহবুব। ৯ নম্বর কামরায় প্রেসিডেন্ট জিয়ার উপর আঘাত হানার দায়িত্ব দেয়া হয় ফজলে আর ক্যাপ্টেন সাত্তারকে।

লেঃ কর্ণেল মতি নিজে থাকলো দ্বিতীয় দলে। তার সঙ্গে থাকলো, মেজর মোমিন, মেজর মোজাফ্‌ফর, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন আর লেঃ মোসলেহউদ্দিন। প্রথম দলটিকে দ্বিতীয় দলটি পেছনে থেকে সহায়তা করে। মেজর গিয়াসউদ্দিন আর ফজলুল হক, ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আর মুনিরকে নিয়ে গঠিত হয় তৃতীয় দলটি।

রাত সাড়ে তিনটার সামান্য কিছু পরে দল তিনটি কালুরঘাট থেকে প্রচন্ড বৃষ্টির মাঝে আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে সামনে বাড়তে শুরু করে। যুবক লেফটেন্যান্ট রফিক প্রথম দলের পিক-আপে বসে কম্পিত স্বরে ফজলেকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কি প্রেসিডেন্টকে খুন করতে যাচ্ছেন?' কর্ণেল ফজলে তাকে জানায়, 'না, আমরা কেবলই তাঁকে তুলে আনতে চাচ্ছি।' কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, শেষ মুহূর্তেও দলের অনেক সদস্য বিশ্বাস করতো যে, তারা প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে এসে জিম্মি করে রাখতে যাচ্ছে।

ঘাতক দল দু'টি বিনা বাঁধায় সার্কিট হাউজে ঢুকে পড়ে। লোহার তৈরি বিরাট বড় সদর দরজাটি অজ্ঞাত কারণে সে রাতে খুলে রাখা হয়েছিলো। পাহারারত চারজন প্রহরী ঘাতকবাহিনীকে বিনা প্রশ্নে ভেতরে যেতে পথ করে দিলো। এ সময় লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন তার হাতের রকেট-লঞ্চার থেকে পরপর দু'টি ফায়ার করে। গোলা দু'টি জিয়ার শয়ন কক্ষের ঠিক নিচের দিকে বিরাট দুটি গর্ত সৃষ্টি করে। সার্কিট হাউজে অবস্থানরত সকলকে ভয় পাইয়ে দিতে এবং ঘাতকদের অন্যান্য দলকে সংকেত দেয়ার জন্যেই ঐ প্রাথমিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই দলের বাকিরা গ্রেনেড, রকেট আর মেশিনগান থেকে গুলি চালাতে শুরু করে। এতে করে সামান্য দু'একজন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারীকে একে বারে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হয়। চট্টগ্রাম ক্লাবের দেয়ালে দর্শকের ভূমিকায় অবলোকনরত দুই মেজরের একজন পরে জানায়, সিনেমায় ছবিতে প্রদর্শিত কমান্ডো আক্রমণের মত সেদিনের হামলা পরিচালিত হয়েছিলো।

নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবল দুলাল মিঞা পোর্টিকোতে প্রহরারত অবস্থায় মাথায় গুলি খেয়ে প্রথম প্রাণ ত্যাগ করে। পাহারারত বাকী ৪৪ জন সশস্ত্র পুলিশের কেউ কোন রকম প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে নি। তাদের কেঁউ ছুটে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালায়। ঘাতক দলের এলোপাথাড়ি গোলাগুলি আর ছোটাছুটির কারণে আরো ১২ জন পুলিশ আহত হয়।

ঐ সময় কর্তব্যরত প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের সৈন্যরাও তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলো। যে দু'জন সৈন্য প্রেসিডেন্টের কক্ষের সামনে পাহারারত থাকার কথা, তাদের একজনকে নিচতলায় মৃত এবং অন্যজনকে তার কোয়ার্টারে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। নিচতলার সৈন্যরা সম্ভবতঃ প্রেসিডেন্টের কক্ষের দিকে যেতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু এর আগেই তাদেরকে খতম করে দেয়া হয়।

আশ্চর্যজনকভাবে সার্কিট হাউজের নিরাপত্তা প্রহরীদের গুলিতে হানাদারদলের কেউ নিহত বা আহত হয় নি। তাদের দু'জন নিজেদের লোকদের গুলিতেই আহত হয়েছিলো। এর মধ্যে লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন পেছনের দলের বেপরোয়া গুলিতে ঘোরতর আহত হয়ে অভিযান থেকে সরে পড়ে। ক্যাপ্টেন জামিলও ঠিক সেভাবেই আহত হয়েছিলো। কিন্তু যেভাবেই হোক, আহত শরীরে জামিল সার্কিট হাউজের দু'তলায় উঠে নায়েক রফিকুদ্দিনকে গুলি করে আহত করে। প্রেসিডেন্টের প্রধান নিরাপত্তা অফিসার লেঃ কর্ণেল মইনুল আহসান এবং ক্যাপ্টেন আশরাফুল খান তখন দু'তলায় প্রেসিডেন্টের পেছনের কক্ষে ঘুমুচ্ছিলো। রকেটের আওয়াজে তারা জেগে উঠে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাদের অস্ত্র হাতে প্রেসিডেন্টের জীবন রক্ষায় ছুটে আসছিলো। তারা তাদের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পাবার আগেই আক্রমণকারীদের গুলিতে নিবেদিত প্রাণ এই দুই অফিসারের নিষ্প্রাণ দেহ বারান্দায় লুটিয়ে পড়ে।

পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পেছনের ঘাতক দলটি কর্ণেল মতিসহ এই সময়ে দু'তলায় অন্যান্য আক্রমণকারীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ৯ নম্বর কক্ষ খুঁজতে শুরু করে। ক্যাপ্টেন সাত্তার লাথি মেরে ঐ কক্ষের দরজা ভেঙে ফেলতেই সে দেখে ঘরে অবস্থানরত ডঃ আমিনা রহমান। ফলে প্রেসিডেন্টের খোঁজে ওরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এসময়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, প্রেসিডেন্ট কোথায়? প্রেসিডেন্ট কোথায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা বুঝতে পারে যে, প্রেসিডেন্ট ৪ নম্বর রুমে অবস্থান করছেন। রুমটি সিঁড়ির গোড়ায়। রুমের একটি দরজা সিঁড়ির দিকে আর একটি দরজা বারান্দার দিকে। ক্যাপ্টেন সাত্তার তাদের একজনকে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'প্রেসিডেন্ট বেরিয়ে আসছেন।' এক মুহূর্ত পরেই আর একজন চিৎকার করে বলে উঠে, 'এইতো প্রেসিডেন্ট'।

সাদা পায়াজামা পরা এলোমেলো চুল। প্রেসিডেন্ট অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন। তাঁর হাত দুটি সামনের দিকে সামান্য উঁচিয়ে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি চাও?'

প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে কাছে ছিলো মেজর মোজাফফর আর ক্যাপ্টেন মোসলেহউদ্দিন। মেজর মোজাফফর দৃশ্যতঃ ভয়ে কাঁপছিলো। মোসলেহউদ্দিন প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলো। সে বলছিলো, 'স্যার, আপনি ঘাবড়াবেন না। এখানে ভয়ের কিছুই নেই।'

কি আশ্চর্য! ঐ দু'জন অফিসার তখনও মনে করছে, তারা প্রেসিডেন্টকে উঠিয়ে নিতে এসেছে, হত্যা করতে নয়। লেঃ কর্ণেল মতিও কাছাকাছিই ছিলো। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি তার বিন্দুমাত্রও দয়ামায়া ছিলো না। সে প্রেসিডেন্টকে একটুও সুযোগ দিলো না। মোসলেহউদ্দিনের ঠোঁট থেকে জিয়ার প্রতি তার আশ্বাসের বাণী মিলিয়ে যাবার আগেই মতি তার এসএমজি থেকে গুলি চালিয়ে দেয়। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে জিয়ার শরীরের ডানদিক একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলে। দরজার কাছেই জিয়া মুখ থুবড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। রক্তের বন্যায় তাঁর সমস্ত শরীর ভেসে যেতে থাকে। খুনের নেশায় ঘাতক মতি পাগল হয়ে উঠে। সে তার বন্দুকের নল দিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রাণহীন দেহ উল্টিয়ে নেয়। তারপর জিয়ার মুখমন্ডল আর বুকের উপর এসএমজির ট্রিগার টিপে রেখে ম্যাগজিন খালি করে তার খুনের নেশা মিটিয়ে নেয়। গুলির আঘাতে জিয়ার মাথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কল্পনাও আসেনা পারছি না।, কি ধরনের ক্ষোভ কর্ণেল মতি তার মনে রেখেছিলো! জিয়াকে নৃশংসভাবে খুন করে খুনীরা ঝটপট সার্কিট হাউজ ছেড়ে চলে যায়। দু'জন আহত সঙ্গীকেও তারা সঙ্গে নিয়ে যায়। পুরো হত্যাকান্ডটি কুড়ি মিনিটেরও কম সময়ে সম্পন্ন হয়েছিলো।

তো ভাই, জীবন তো এই।

তাকদীর তাকে বেঁধে দিয়েছে ক্ষীণ সুতোয়। নির্দিষ্ট সময় সীমায়। তার এক পলকও এদিক ওদিক হবে না।

কিন্তু মানুষ তৈরি হয় না মৃত্যুর জন্যে। শুরু করে না নেক আমল। সে শুধু চিন্তা করে এটা করবো ওটা করবো। তারপর একদম আচমকা এসে পড়ে আজরাইল।

যে নিজের মৃত্যুর ষড়যন্ত্র আধমাইল দূরে বসে টের পায় না, সে তার জনতাকে কী দেবে?

এমন দু'জন রাষ্ট্রপতির কাছে জনতারই কী চাওয়ার আছে?

জনতা চাইবে আল্লাহর কাছে।

নেতা চাইবে আল্লাহর কাছে।

খলিফাতুল মুসলিমীন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মুসলিম জাহানের খলিফা।

তাঁর সময় একবার মদিনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ভয়াবহ অবস্থা। লোকজন মারা পড়লো।

মিসরের গভর্ণর তখন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। তিনি সাহায্য সামগ্রী পাঠালেন। উট বোঝাই খাবার, পোশাক, তৈজসপত্র। সুবিশাল বহর। প্রথম উটটি যখন মদিনার উপকণ্ঠে তখন শেষ উট মিসর সীমান্তে। তবু অভাব মিটলো না। দুর্ভিক্ষ দানা বেঁধে উঠলো।

একদিন।

এক সাহাবী একটা বকরি জবাই করলেন। আর আশ্চর্য এই বকরিটিতে কোনো গোশ্‌ত ছিলো না। শুধু হাড় আর রক্ত। ওই সাহাবী এই ঘটনাকে আল্লাহর আজাব মনে করে ভয়ে চিৎকার করে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। ওই অবস্থায় তিনি স্বপ্নে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন।

তিনি বললেন, 'আমি ওমরকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। তার কী হলো?

জ্ঞান ফেরার সাথে সাথে সাহাবী ছুটলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে। চিৎকার করতে করতে। হুজুরের খবর আছে ওমরের কাছে।

পরিবেশ এমন হলো যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম জীবিত। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন। হযরত ওমর দাঁড়িয়ে গেলেন। সবাই উৎসুক। সাহাবী সব কথা খুলে বললেন।

হযরত ওমর পরামর্শ করলেন।

তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন আমরা সৃষ্টির সাহায্য চাইছি। স্রষ্টার হাত ধরছি না। সেজন্যে এখনি ঘোষণা হোক, অভাব আর অনাবৃষ্টির সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ইস্তেসকার দু'রাকাত নামাজ পড়া হবে। সবাই যেন মাঠে জড়ো হয়।

নামাজ শেষ হতে না হতে এতোদিনের মেঘহীন আকাশে দেখা দিলো মেঘের ঘনঘটা। প্রার্থনা শেষ। মেঘের ভেতর থেকে বজ্র নির্ঘোষ আওয়াজ ভেসে এলো। 'আতাকাল গাউসো আবা হাবসীন'।

অর্থাৎ 'তুমি ডাকলে আমি সাড়া দিলাম'।

আজ জনতা চায় সরকারের কাছে।

সরকার চায় বিদেশীর কাছে।

আল্লাহ ক্ষমা করুন।

না ভাই, চাইতে হবে পরম প্রভুর কাছে। তিনি শুনতে তৈরি। যদি সারা দুনিয়ার সব জ্বিন আর মানুষ একসাথে চায় তিনি সবার চাওয়া পূর্ণ করেন।

'অসিয়া সামিউল আখলাক' তাঁর শোনার ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত রয়েছে যে গোটা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতে শুরু করে, আর সেটা যদি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে আর আসবে সবাই মিলে বলে, তবুও তিনি তা এক পলকে শুনে নেন। প্রত্যেকের আলাদা কথা, ভাবভঙ্গী, দাবীদাওয়া, চাওয়াপাওয়া সব তিনি শুনে নেন হুবহু। তা জীবিত হোক বা মৃত, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দানব হোক বা মানব, কীট বা পতঙ্গ, জীব হোক বা জানোয়ার, হিংস্র জীব হোক বা নিরীহ প্রাণী, কালো মানুষ হোক বা সাদা, আরবী হোক বা আজমী, পশতুতে হোক বা হিন্দী, আরবীতে বলে বা বাঙলায়, উর্দুতে বলে বা হিব্রু, ইংরেজীতে বলে বা ফ্রেঞ্চ, ডাচ ভাষায় বলে বা ল্যাটিন-সারা দুনিয়ার সব ভাষাভাষীর মানুষ বলুক বা বিচিত্র নিজস্ব ভাষায় জীব জানোয়ার, কীট পতঙ্গ, পোকা মাকড় সবাই যদি একসাথে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ তা শুনে নেন। পলকে। এক মুহূর্তে।

'লা ইয়ুস্‌মিলুহু শামআন্ আন্ শাম্, ওয়ালা কাওলাম্ আন্ কাওল, ওয়ালা মাসআলাম্ আন্ মাসআলা।' আল্লাহতায়ালা এমন প্রতিপালক ও শ্রোতা যে, যে কোনও ভাবে যে কোনও ভাষায় যা কিছু বলে শুনে ফেলেন। কোনও শোনাতে ভুল হয় না। আর প্রত্যেকের কথা শোনেন। কমা, দাঁড়িসহ।

আমরা কি জানি কেন ইয়াকুব আলাইহিসসালাম এর কাছ থেকে তার নয়নের মণি, আদরের নবী সন্তান, ইউসুফ আলাইহিসসালাম কে কেড়ে নিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? চল্লিশ বছর ধরে পিতা পুত্র আলাদা ছিলেন।

কেন?

মিশর থেকে শ্যামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) মাত্র এক মাসের পথ অথচ কেউ কারো দেখা পাচ্ছে না। জানতে পারছে না। কে কোথায়? কতদূর? কেমন আছে? ইউসুফ আলাইহিসসালাম এর অনুমতি নেই যে পিতাকে জানায় আমি কাছে আছি, পাশেই আছি, ভাল আছি। কেঁদো না।

ওদিকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ইয়াকুব আলাহিসসালাম এর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'ওয়াব ইয়াদ্দাতা আয়না মিনাল হুজ্‌নি ফাহুয়া কাবিম।'

তারপর যখন দেখা হলো ইয়াকুব আলাইহিসসালাম আবার চক্ষুষ্মান হলেন।

বাপ বেটার মিলন হলো।

তখন আল্লাহতায়ালা ইয়াকুব আলাইহিসসালাম কে বললেন, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে তোমার সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম? কারণ একদিন তুমি নামাজ পড়ছিলে। পড়তে পড়তে আচমকাই তোমার কানে ভেসে এলো ইউসুফের কান্নার শব্দ।

তোমার দৃষ্টি পিছলে চলে গেল ইউসুফ আলাইহিসালামের দিকে। আমি তীব্র অভিমানে সিদ্ধান্ত নিলাম বিচ্ছিন্ন করবো তোমাকে ইউসুফের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সৃষ্ট ইউসুফের দিকে আমার নবীর দৃষ্টি! নবী হয়ে স্রষ্টাকে অবহেলা করে সৃষ্টির দিকে নজর। আল্লাহ তার সাথে কারও অংশীদারী পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা মহান বিশ্বপ্রভু তার ভালবাসায় কারও অংশী পছন্দ করেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মতো খলিল যখন তার নবী পুত্র ঈসমাইল এর দিকে বার বার মমতার দৃষ্টি ফেলছেন জবাই এর পূর্ব মুহূর্তে (আর এটা স্বাভাবিক পিতা তার পুত্রকে এমন সঙ্গীন মুহূর্তে দেখবেই। তা জেনে হোক বা অজান্তেই।)

তো ঠিক তখনি অদৃশ্য থেকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন, 'ইব্রাহিম, ছুরি চালাও--ছুরি চালাও--!!

সত্তুর বার ছুরি চালালেন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম।

প্রথম বারেই দুম্বা রাখতে পারতেন আল্লাহতালা। কিন্তু বার বার তাকে দিয়ে ছুরি চালালেন। ছুরি চালাতে চালাতে অন্তর থেকে সব অপত্য স্নেহের উদ্দীপনা নিঙড়ে বের করে নিলেন। প্রতিবার ছুরি চালাচ্ছেন ছেলের গলায়! আপন ছেলে "নবী" বুক ভরা ভালবাসা! তিল তিল করে বলি দিচ্ছেন। উজাড় করা পুত্র প্রেম মুখ থুবড়ে পড়েছে। আসমান জমিন নিথর । রুদ্ধশ্বাস। আসমানের বাসিন্দাদের মাঝে কান্নার রোল!

সত্তুর বার ছুরি চালানোর পর পুত্রের জন্য আর কিছুই রইলো না নবী ইব্রাহিম এর মনের কোণে! বাকী থাকলো আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিশ্ছিদ্র আর নির্ভেজাল উদ্দীপনা! উদ্যম!

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'ওয়ালা ইয়াতাবাররাম বি আল্হাহি ওয়াবিল হাজাত।'

'আর তোমাদের চাওয়া, পাওয়া করে দেখাতে আমার কোনও অভাব পড়ে না।'

কোনও মানুষের কাছ থেকে জান বাঁচাতে চাও তো তার কাছে ধার চাও; সে তোমার বাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিবে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাও তো তার কাছে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন চাও। তিনি তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন। তার রহমত টুকরো টুকরো হয়ে চলে আসবে তোমার কাছে। তাঁর কাছে চাইলে খুশি হন, না চাইলে নারাজ হন। তিনি এমন দেনেওয়ালা, এমন দাতা যে জান্নাতের সবাইকে একত্রিত করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত লোক বেহেশতী হয়েছে তাদের সবাইকে ডাকবেন। বলবেন 'আমার বান্দা আজ তুমি চাইবে আমি দেবো। আজ চাও।'

'লান কুমাতিমাল ইয়াওমা বিক্বাদ্‌রি আমালিকুম-'

'আজ তোমাদের পূণ্যকর্মের প্রতিদান হিসেবে দেব না। দেবো আমার রহমত থেকে। কাজেই চাও।'

বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আর কী চাইবো, তুমি তো সবকিছু দিয়েছো!'

'না বান্দা, তবুও চাও।'

'আচ্ছা, হে পরম প্রভু তুমি আমাদের উপর রাজী হয়ে যাও, 'তখন বান্দা বলে।

আল্লাহ পাক বলেন, 'বিরাদা-ই ইয়ান্‌কুম আহ্‌লাল্‌তুকুম বি দুয়ারী-'

'আরে! রাজী হয়ে গেছি বলেই তো এখানে বসিয়েছি। আজ এখন চাও, কী চাইবার আছে?'

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবে বান্দা। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছো, আরো চাও।' আবার চাইতে শুরু করবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা।

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ। আরও চাও।'

'আর কি চাওয়ার আছে?'

'এখন পর্যন্ত তো তোমরা তোমাদের শান মতো চেয়েছ। এবার আমার শান মতো চাও।'

এবার বান্দারা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে। কী চাওয়া যায়? চাওয়ার তো আর কিছু দেখছি না। আজ তাদের বুদ্ধি কিন্তু পার্থিব বুদ্ধি নয়, বেহেশতী বুদ্ধি। বেহেশতী মস্তিষ্ক.

বেহেশতী মেধা, বেহেশতী চিন্তা ক্ষমতা। তবু তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের চাওয়ার আর কী বাকী থাকতে পারে।

আবার আল্লাহতায়ালা বলেন, 'বান্দা, আরো চাইতে থাকো।'

বান্দা আবার প্রার্থনা করতে থাকবে। ক্লান্ত, দিশেহারা। তারা বলবে, 'ও আল্লাহ, আর তো চাওয়ার কিছুই দেখছি না! কি চাইবো?

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'ইয়া ইবাদি ক্বাদ রাদিতুম বিদুনি মা ইয়াশাকু লাকুম-'

'আরে আমার বান্দা, তুই তো নিজের শান মতো চেয়েছিস। আমার শান মতো কিভাবে তুই চাইবি? যা, তোর শান মতো যা চেয়েছিস তাও দিলাম। আর আমার শান অনুযায়ী যা তুমি চাইতে পারো নাই তা-ও দিলাম!'

দাতা তো এমনই হওয়া চায়।

এখন বলেন ভাই, এমন দাতা প্রতিপালকের প্রতি মন প্রাণ না সঁপে দেয়া কতবড় অন্যায়! এই অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রভাব না থাকা। স্রেফ আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহরই স্থান অন্তরে থাকবে। আর আল্লাহতায়ালা তার বান্দার কাছে চান ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী চায় স্বামীর অন্তরে একমাত্র তার ভালবাসা বিরাজ করুক। তারপর সে তাকে শুকনো রুটি দিক।

মানুষ যখন মৃত্যু আর পরকালকে সামনে রেখে চলবে তখন তার সাথে সৃষ্টি হবে পরম প্রভু আল্লাহর গভীর সম্পর্ক। খেতে আর পরতে সে আল্লাহ ছাড়া কারো দিকে ভরসার দৃষ্টি ফেলবে না। এই সম্পর্ক আনবে তার মাঝে, তার পরিবারের মাঝে, তার দেশবাসীর মাঝে অনাবিল শান্তি।

তখন আর ঘটবে না কোনো দুঃখজনক ঘটনা।



আট

যারা নেক জীবন কাটায় আর পরকালের ওপর অবিচল বিশ্বাস রাখে এই দুনিয়াতে তাদের মন বসে না। মৃত্যুকে তারা ভয় পায় না। তারা জানে যে মৃত্যুর পরই রয়েছে অনাবিল শান্তি।

সুলাইমান ইবনে আবুদুল মালিক একবার আবু হাসিম রহমতুল্লাহি আলাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আমরা মরণকে ভয় পাই কেন?

তিনি জবাব দিলেন, 'আসলে আমরা পরকালকে ভুলে দুনিয়া নিয়ে পড়ে থাকি। দুনিয়ার উন্নতি করতে থাকি। পরকালকে নষ্ট করে। আমাদের দুনিয়া উন্নত হয়। সুন্দর হয়। পরকাল বরবাদ হয়। বিরাণ হয়। তো কে উন্নত আর সুন্দরকে ছেড়ে অনাবাদ আর বিরাণ জায়গায় যেতে চায়?'

সৎকাজ করে। সৎকাজের দিকে মানুষকে ডেকে। দুনিয়াতে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে তুলে। আখিরাতকে আবাদ করে। পরকালের শান্তির ব্যবস্থা করে মরতে ভয় কি?

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

'মানুষ বেঁচে থাকতে প্রিয় জানে, আসলে মৃত্যু ছিল তার জন্যে মঙ্গল।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন, 'একদিন একটা মাটি রঙ ভেড়া আনা হবে। বেহেশত ও দোজখের মাঝখানে। একজন ঘোষণা দানকারী চিৎকার করে বলবে, 'হে জান্নাতিরা, দেখো।'

বেহেশতীরা গলা বাড়িয়ে দেবেন।

'চিনতে পারছো, তোমরা একে?'

'হ্যাঁ,' সবাই বলবে, 'চিনতে পারছি।'

'এটা কি?'

'মৃত্যু!'

তারপর ফের সেই ঘোষণা কারী চিৎকার করে বলবে-

'হে দোজখীরা, দেখো।'

জাহান্নামীরা গলা বাড়িয়ে দেখবে।

'চিনতে পারছো একে?'

'হ্যাঁ!' তারা বলবে।

'কি?'

'মৃত্যু!'

তখন তাকে জবাই করে দেয়া হবে।

ঘোষক বলবে, 'হে স্বর্গের বাসিন্দারা! চিরকাল থাকো এখানে। মৃত্যু আর নাই।'

'হে নরকের অধিবাসীরা! চিরদিন পড়ে থাকো হেথায়। মৃত্যু আর নাই।'

আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে বলেন-

'আমিই মৃত্যুকে দিয়েছি তোমাদের জন্যে। আর তাতে আমি অপারগ নই।'

মানুষের জন্মের আগেই চারটা বিষয় লিখতে আদেশ দেয়া হয়েছিলো।

(এক) কি করবে?

(দুই) কি খাবে?

(তিন) কতদিন বাঁচবে?

(চার) দুর্ভাগা না সৌভাগ্যবান?

কাজেই যতদিন তার বেঁচে থাকার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে তারপর তাকে মরতেই হবে।

মৃত্যু আসবেই।

মৃত্যুর একটা নির্দিষ্ট চেহারা আছে।

আকৃতি আছে। আছে প্রকৃতি।

সে আল্লাহতায়ালার এক আশ্চর্য সৃষ্টি।

মরণের সময় সমস্ত প্রাণী দেখতে পায় সেই তাকে। মৃত্যুর কায়াকে।

ভয়াল, ভয়ঙ্কর সে মূর্তি!

এর রূপ দেখে চমকে যায় পাপী, তাপী, মানুষ, পশু। সব।

এর ভয়াল হাত যখন বুকের ওপর পড়ে তখন বেহুঁশ হয়ে যায় সৃষ্টি।

চিৎকার করার সুযোগ থাকে না।

পালানোর পথ নেই।

বীভৎস। রক্তহিম করা তার আকার।

এমনি সংহার তার মূর্তি যে সারাজীবন 'আমি সবচেয়ে বড় খোদা' যে দাবী করেছে সেও ভীত শঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে বলে।

'আমি ইমান আনলাম মুসা আর হারুনের আল্লাহর ওপর। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। আর আমি মুসলমান হলাম।'

দুই জাহানের বাদশাহ দয়ার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

'মহান স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা জাল্লা শানুহু মৃত্যুকে সৃষ্টি করলেন। তাকে লুকিয়ে রাখলেন শত পর্দার ভেতর। পৃথিবী আর আকাশ জগতের চেয়ে বড় আকৃতি দান করলেন। তাকে সত্তরটা শিকল দিয়ে বাঁধা হলো। একেকটা শিকলের দৈর্ঘ হাজার বছরের রাস্তার চেয়ে বেশি। ফিরিশতারা তার পাশ দিয়ে আসা যাওয়া করতো কখনো সখনো। কিন্তু মৃত্যুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতো না।

তৈরি হলো আদি মানুষ আদম আলাইহিস সালাম।

এবার জীবের প্রাণ হরণ করার কাজের জন্যে ডাকলেন আজরাইল আলাইহিসালামকে।

'মৃত্যু আবার কি, প্রভু!' তিনি শুধালেন।

মহাপরাক্রান্ত প্রভু আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন তখন এক এক করে খুলে ফেললেন এক শো পর্দা।

তিনি ডাকলেন সব ফিরিশতাদের।

তাদের বললেন, 'দেখো মৃত্যুকে।'

সব ফিরিশতারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। দেখার জন্যে তৈরি।

এবার মৃত্যুর উদ্দেশে বজ্র নির্ঘোষে বললেন, 'মৃত্যু! তোমার সব কটা পাখা মেলে উড়ে বেড়াও এদের ওপর।

সব চোখ খোল। এদের দিকে তাকাও।'

মহান আল্লাহর হুকুম মতো মৃত্যু মেলে দিল পাখা। উড়তে শুরু করলো। মাথার ওপর। চোখ খুললো। দৃষ্টি ফেললো। ফিরিশতাদের ওপর।

ভয়াবহ চিৎকার দিয়ে জ্ঞানহারা হলো। সব ফিরিশতা!

ভয়ঙ্কর সেই মূর্তি দেখে।

হাজার বছর পর ফিরলো তাদের চেতনা।

তারপর আল্লাহ আজরাইলকে ডাকলেন। বললেন, 'প্রাণীদের জীবন নেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম।'

আজরাইল পরম অনুনয়ে ভেঙে পড়লো। বললো, 'হে মহান প্রভু! আল্লাহ তায়ালা এটা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ সে তো আমার চেয়ে অনেক ক্ষমতাধর সুবিশাল।'

তখন আল্লাহতায়ালা আজরাইল আলাইহিসসালামকে মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী করে দিলেন।

তো ভাই মৃত্যুর এমনই সংহার মূর্তি যে আজরাইল আলাইহিস সালাম তাকে দেখে হাজার বছর বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুখ কে ধ্বংস করে এমন জিনিষকে অনেক বার মনে করো।'

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'সেটা কি?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মৃত্যু! মৃত্যু" মৃত্যু!'



নয়

অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'তারপর যখন প্রাণ কণ্ঠার কাছে এসে পৌঁছায় তখন কেন তোমরা তাকে ফিরাও না।

তোমরা শুধু চেয়েই থাকো।

আর আমি তোমাদের তার চেয়ে বেশি কাছে থাকি। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

তাহলে কেন তোমরা তাকে ফেরাও না যদি ক্ষমতা থেকে থাকে?

অন্য জায়গায় বলেন-

'আর সে জানবে, নিশ্চয়ই এই সেই যাবার বেলা। তখন তো সে যাতনার ওপর যাতনায় অস্থির।

'সব মহিমা আল্লাহর! যিনি তৈরি করেছেন যাবতীয় সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায়। তার মাঝে কিছু সম্পর্কে তোমরা জানো আর কিছু জানো না।'

যেমন, চন্দ্র সূর্য।। রাত দিন।

আঁধার আলো। নদ নদী।

নর নারী।

ঠিক তেমনি দু'ধরনের মানুষ।

ভালো ও মন্দ।

নেক্কার ও বদকার।

পূণ্যবান। পাপিষ্ঠ।

মৃত্যুও দু'ধরনের।

খারাপ আর ভালো।

হযরত ইবনি জুরাইজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললেন, "ঈমানদার ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় চলে আসে তখন ফিরিশতারা তাকে বলে তুমি নাহয় দুনিয়াতে থাকো?' মানুষটি বলে, 'আশ্চর্য! আপনারা কি আমাকে অশান্তি আর দুশ্চিন্তার দুনিয়ায় রেখে যাবেন? আমি আর এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না। আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে চলুন।'

(ইবনে জারীর)

হযরত জায়িদ ইবনি আসলাম রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু বলেন, 'মৃত্যুর সময় পূণ্যবান মানুষের কাছে আসে মালাইকা বা ফিরিশতা। তাকে শোনায় সুখবর। বলে, তুমি যেখানে যাচ্ছো সেখানে কোনো ভয় নেই। শুনে পূণ্যবান মানুষটির ভয় কেটে যায়। ফিরিশ্তারা তাকে বলে দুঃখ করো না যে তুমি ছেড়ে চলে যাচ্ছো। দুনিয়া আর তার লোকজনকে। আর শোনো, তোমার ঠিকানা হয়েছে বেহেশ্‌ত। সেজন্যে বিশ্বাসী বান্দা এমনভাবে মরে যে দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাকে শান্তি দিয়ে দেয়। (ইবনি আবু হাতিম)

হাদিসে পাকে আসছে আল্লাহ তায়ালা জাল্লাশানুহু যখন কোনও বান্দার ওপর খুশি হন তখন আজরাইল আলাইহিস সালামকে ডাকেন। বলেন, 'যাও আমরা ক্রীতদাসের প্রাণ নিয়ে এসো। এখন ওকে আমি শান্তি দেব। সে তেমন জীবন কাটিয়েছে যেমনটি আমি চেয়েছিলাম।'

আজরাইল আলাইহিস সালাম পাঁচশো ফিরিশতাকে ডাকাডাকি করেন। তারা জড়ো হয়। তাদের নিয়ে নেমে আসেন মাটির পৃথিবীতে।

প্রতিটি ফিরিশ্‌তার কাছে থাকে একটা করে সুসংবাদ।

মুমূর্ষু মানুষটি তখন ছটফট করছে।

এক একজন ফিরিশ্‌তা তার সামনে আসে। তাকে শোনায় সুসংবাদ। নতুন নতুন। সে অবাক। বিহ্বল। আনন্দিত! ব্যাকুল। অস্থির! সে তাড়াতাড়ি দুনিয়া থেকে চলে আসতে চায়।

একেক জনের সুখবর শোনে সে। আনন্দে অধীর হয়ে পড়ে।

একজন ফিরিশ্‌তা যা শোনায় অন্যজন তা শোনায় না।

সে নতুন একটা সংবাদ শোনায়।

ফিরিশতারা নিয়ে এসেছে রাইহান ফুলের ডাল। জাফরানের শেকড়।

ফিরিশ্‌তারা দুটো কাতার করে।

দাঁড়িয়ে যায় দু'পাশে।

ওদিকে আঁধার জগতের হোতা আর নেতাদের ওঠে নাভিশ্বাস। ইবলিস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কাঁদতে থাকে চিৎকার দিয়ে। তার শিষ্য, চেলা বেলারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ছুটোছুটি শুরু করে। পরে তাদের সর্দারের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে।

তারা বলে, 'প্রভু! একী হলো!'

শয়তান বলে, 'দেখতে পাচ্ছো না! হতভাগারা! কি কাজ করছো তোমরা? কোথায় মরে পড়েছিলে?'

তারা বলে, 'হে আমাদের নেতা, চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। বার বার তাকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছি। নানান লোভ দেখিয়েছি। নানান কৌশলে চেয়েছি তাকে পথহারা করতে। কিন্তু আশ্চার্য! আমাদের সব কষ্ট আর চেষ্টাকে সে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনা। তাকে দিয়ে পারিনি কোনো পাপ কর্ম করাতে। সে সুকৌশলে মহান আল্লাহ তায়ালার দয়ায় পাশ কেটে চলে গেছে।

সে বেঁচে গেছে, প্রভু!'

হযরত বারা ইবনে আযিয রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'একদিন আমরা ক'জন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক কবরস্থানে গেলাম। একজন আনসারী কে দাফনের জন্যে।

ওখানে গিয়ে দেখি এখনো কবর তৈরি হয়নি।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গম্ভীর। বিষণ্ন। চিন্তাচ্ছন্ন। একজায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন।

তার চারপাশে আমরা বসলাম, গাঢ় নিরবতা নামল্যোই চুপ। এমন অবস্থা যে মাথার ওপর একটা পাখি বসলে বুঝবে না আমরা জড় না প্রাণ।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের হাতে রয়েছে একটা কাঠের টুকরো। সেটা দিয়ে তিনি আপন মনে মাটি খুঁড়ছেন। খানিক পরে তিনি মাথা তুলে বললেন, 'হে আমার সাথীরা! তোমরা আল্লাহর দরবারে কবর আজাব থেকে মুক্তি চাও।'

এই কথাটা তিনি দু'বার কি তিনবার উচ্চারণ করলেন।

পরে বললেন, 'শোনো আমার সাথীরা! মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আসমান থেকে ফিরিশতা তার কাছে আসে।

সূর্যের মতো ঝলমলে তাদের চেহারা। তাদের সাথে এনেছে বেহেশ্‌তি কাফন। জান্নাতী সুগন্ধি। মুমূর্ষু মানুষটির যতো দূর চোখ যায় তত দূর পর্যন্ত তারা বসে পড়ে। সুশৃঙ্খল ভাবে।

এবার আসেন আজরাইল আলাইহিস সালাম। তিনি মুমূর্ষু লোকটির মাথার কাছে বসে পড়েন। বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা আর সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো।'

এ কথা শুনে দ্বিধা না করে আত্মা বের হয়ে আসে। যেমন পানির পেয়ালা থেকে বেরিয়ে আসে পানির ফোঁটা।

আজরাইল আলাইহিস সালাম হাতে নিয়ে নেন আত্মাটিকে।

পলকে অনেকদূর পর্যন্ত বসে থাকা ফিরিশ্‌তারা তার থেকে আত্মাটি নিয়ে নেয়। খুশবু দেয়। কাফনে জড়িয়ে নেয়। ছোটে আকাশ পানে।

হযরত ইবনি মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন, 'আযরাইল আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে আসে তখন তাকে সালাম জানায়।

বলে,

তোমার ওপর শান্তি হোক।

হে আল্লাহর বন্ধু ওঠো।

সেই আবাসের দিকে যাকে তুমি আবাদ করেছো।

হযরত তামিম দারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে ডেকে বলেন, 'যাও আমার অমুক বন্ধুর কাছে। তার আত্মা নিয়ে এসো। আমি খুশি আর দুঃখ দুই অবস্থায় তাকে পরীক্ষা করেছি। সে আমার মনের মতো জীবন যাপন করেছে। সফলকাম হয়েছে। এখন আমি চাই তাকে নিয়ে এসো। সে মুক্তি পাক দুনিয়ার কষ্ট আর ক্লেশ থেকে।'

আজরাঈল আলাইহিস সালাম তখন পাঁচশো ফিরিশ্‌তা নিয়ে নেমে আসে।

প্রতিটি ফিরিশ্‌তার হাতে রাইহানের ফুলদানি থাকে। প্রতিটি ফুলদানিতে কুড়ি রঙের ফুল থাকে। প্রতিটি রঙের আলাদা খুশবু। একটা সাদা রঙের রুমালে মেশকের মনোমুগ্ধকর সুগন্ধি ছড়ায়।

সাদা রুমালটা মুমূর্ষু মানুষটার থুতনির নিচে রাখে ফিরিশ্‌তা। ঠিক তখনি খুলে যায় জান্নাতের দরোজা। সে অবাক হয়ে দেখতে থাকে। শিশুরা কান্নাকাটি করে। মা তখন নানা জিনিষের লোভ দেখায়। বাচ্চা থেমে যায়। তেমনি এটা সেটা দেখাতে থাকে তাকে ফিরিশ্‌তারা। কখনো হুর, কখনো ফুল কখনো অপরূপ পোশাক। তাকে বলা হয় এসব তোমার। বেহেশতে রয়েছে। চলো।

হুরেরা তার সামনে আনন্দে হেসে খেলে বেড়ায়। অলৌকিক সুরে গান গায়।

মুমূর্ষু মানুষটি ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাকে পাবার জন্যে।

আত্মা তার শরীর থেকে বেরুবার জন্যে ছটফট করতে থাকে।

তখন আজরাইল আলাইহিস সালাম তাকে বলে, 'ওহে পবিত্র আত্মা! কাঁটা ছাড়া কুল, সারি সারি কলা, সুবিশাল ছায়াঘেরা প্রবাহিত পবিত্র ঝর্নার পানির বেহেশতে চলো।'

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন----

'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে এসো প্রভুর কাছে। যিনি তোমার ওপর খুশি ও রাজী! তারপর ঢুকে পড়ো হে বান্দা, বেহেশ্‌তে।'

প্রশান্ত পূণ্যাত্মার ওপর মহান স্রষ্টা খুশি। রাজী। তারা আয়াশে প্রবেশ করবে জান্নাতে।

পবিত্র ইঞ্জিলে এ কথা রয়েছে। বারবার।

গীতা সংহিতাতে লেখা আছে, 'সদাপ্রভুর চোখে তার সাধুদের মৃত্যু মহামূল্যবান।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শিশু যেমন মায়ের গর্ভ থেকে-বের হয়ে আসে, পবিত্র মানুষেরা তেমনি দুনিয়া থেকে বের হয়।'

আজরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে সেই পবিত্র আত্মার সাথে খুব কোমল ব্যবহার করে থাকে। যেমন মা তার শিশুর সাথে করে থাকে।

তারপর সেই রুহ এমনভাবে শরীর থেকে বের হয় যেমন আটা থেকে পশম বের হয়।

আত্মা বের হবার পর সব ফিরিশতা তাকে সালাম করে। বেহেশ্‌তে প্রবেশ করার সুসংবাদ দেয়।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'ওই সব পবিত্র নৈকট্য প্রাপ্ত আত্মাদের সুসংবাদ দেয় ফিরিশতারা।'

শরীর থেকে রুহ বিদায়ের সময় বলে, 'আল্লাহ তোমাকে ভালো প্রতিদান দিক। তুমি ইবাদাত করতে তাড়াতাড়ি। আর অলসতা করতে পাপ করতে। তুমি নিজেও শাস্তি থেকে বেঁচেছো আমাকেও মুক্তি দিয়েছো। তোমাকে ধন্যবাদ। শরীর তাকে একই কথা বলে।

তার মৃত্যুতে পৃথিবী কাঁদে।

ওই অংশ যেখানে সে ইবাদত করতো। আমল উপরে যেতো।

তার মৃত্যুতে আকাশ কাঁদে। ওই অংশ যেখান দিয়ে তার রিজিক আসতো। আমল যেতো। অন্য এক হাদিসে আসছে 'মুমিনের রুহ সংহার কারার সময় আজরাইল আলাইহিস সালাম তার হাত মুমূর্ষু মানুষটির বুকে রাখেন। তার আগেই পূণ্যাত্মা বলে, 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া তুমি আমাকে নিতে পারবে না। তোমাকে তো চিনি না।'

আজরাইল আলাইহিস সালাম বলবেন, 'আমি তো আল্লাহর আদেশেই এসেছি।

তখন আত্মা বলবে, 'আল্লাহ যখন আমাকে সৃষ্টি করে শরীরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তো তোমাকে দেখিনি। এখন কোথা থেকে এলে?'

আজরাইল আলাইহিস সালাম থতমত খেয়ে যান। তিনি ফিরে যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ঠিকই বলেছে আমরা বান্দা। তুমি বেহেশ্‌তে যাও। আমার নাম খোদাই করা একটা ফলক এনে তার সামনে রাখো।'

আজরাইল আলাইহিস সালাম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা একটা ফলক আনবেন। আত্মা বের হয়ে আসবে।

রাসুলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'আজরাইল আলাইহিস সালাম মু'মিন বান্দার মুখের দিকে এগুলে মুখ বলে, 'হে আজরাইল! আর এগিও না। কারণ সে আমাকে দিয়ে সারাক্ষণ আল্লাহতায়ালার গুণগান করেছে।'

এভাবে মৃত্যুদূত যেদিকে যায় বাধা পায়।

হাত, পা, নাক, কান, চোখ, সবাই একই কথা বলে।

হতোদ্যম হয়ে আজরাইল আলাইহিস সালাম এসব আল্লাহ তায়ালাকে বলেন।

আল্লাহ সুব্‌হানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, 'তুমি তোমার হাতের তালুতে আমার নাম লিখে বান্দার চোখের সামনে ধরো।'

হাতের তালুতে আল্লাহর নাম দেখে সেই পবিত্র আত্মা আকুল আর ব্যাকুল হয়ে শরীর ছেড়ে পাগলের মতো বেরিয়ে আসবে। সে তখন ভুলে গেছে মৃত্যু যন্ত্রণা। কষ্ট।'

মৃত মানুষটির গোসলের সময় পাঁচশো ফিরিশ্‌তা অংশ নেয়। কাফন পরানোর আগেই তাকে কাফন পরিয়ে দেয়। জান্নাত থেকে আনা খুশ্‌বু ছড়িয়ে দেয়। তারপর তার বাসার দরোজা থেকে কবর পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। দোয়া পড়ে। আস্তাগফার করে।

অদূরে থেকে শয়তান সবই দেখে।

সে কাঁদতে শুরু করে। চিৎকার দিয়ে।

কান্নার দমকে তার হাড় ভেঙে যায়। সে তার নিজের দলের সঙ্গী শিষ্যদের ডাকে। ধমক দেয়। তিরস্কার করে। ধিক্কার দেয়।

বলে, 'তোদের সর্বনাশ হোক। এই মানুষটা বেচেঁ গেল কী করে?'

সাঙ্গপাঙ্গরা বলে, 'মানুষটা নিষ্পাপ ছিল।'

এবার আজরাইল আলাইহিস সালাম সেই রুহ কে নিয়ে আসমানে যান। হযরত জিব্রাইল আমিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা নিয়ে তাঁকে স্বাগতম জানান। রুহ আরশ্‌ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সিজদায় পড়ে যায়।

আল্লাহ পাক বলেন, 'আমার বান্দার আত্মাকে সারি সারি কলাগাছ আর কাঁটাছাড়া কুল গাছের সুবিশাল ছায়ায় নিয়ে যাও।'

হযরত সুলায়মান ইবনি সুরাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পেটের অসুখে যে মারা যায় তার কবরের আযাব হবে না।' (আহম্মদ, তিরমিজী)

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'রমজান মাসে মৃত্যুবরণ কারীর কবর আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়। (বায়হাকী)

হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু বলেছেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে লোক রোগে শোকে মারা যায় সে শহীদ হয়ে মরলো। বা একথা বলেছেন যে তাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। সকাল সাঁঝে তার জন্যে বেহেশ্‌ত থেকে খাবার আসতে থাকবে। (মিশকাত)

হযরত মিকদাদ ইবনে মাদী কারিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দান করবেন।

(এক) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যখনি তার রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ে।

(দুই) কবরের ভয়াবহ আযাব তাকে ছুঁতে পাবে না।

(তিন) কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ ভয় থেকে সে থাকবে নিরাপদ।

(চার) একটা মুকুট পরানো হবে তার মাথায়। সম্মানিত মুকুট। তাতে থাকবে অসংখ্য ইয়াকুত পাথর। তার একটার মূল্য সমগ্র দুনিয়া আর ভেতর যা কিছু আছে তার চেয়ে বেশি।

(পাঁচ) বড় বড় সুন্দর চোখের হুর দেয়া হবে তাকে।

(ছয়) তার আত্মীয়দের মাঝ থেকে সত্তরজনকে বেহেশ্‌ত দেয়া হবে।

(তিরমিজি, ইবনে মাজা)

হযরত মাসরুক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'আমরা একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনি মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাছে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম-

'যারা আল্লাহর পথে প্রাণ দেয় তাদের তোমরা মৃত বলো না। তারা বেঁচে আছে। তারা জীবিকা পায় পরম প্রভুর কাছ থেকে।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা একদিন রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলাম এই আয়াতটির।'

তিনি বললেন, 'শহীদদের আত্মাগুলোকে সবুজ রঙের পাখির মতো করে রাখা হয়। আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচে তাদের জন্যে সজ্জিত করেছেন আলোকমালা দিয়ে। বেহেশতে তারা ইচ্ছে মতো ঘোরা ফেরা করে। তারপর ফিরে আসে সেই আলোকমালার নিচে।

আল্লাহতায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমার কাছে কিছু চাও কি?'

তারা জবাব দেয়, 'মাবুদ, এর চেয়ে বেশি কি চাইবো?'

আল্লাহতায়ালা তিনবার এই প্রশ্ন করেন।

তিনবার একই উত্তর দেয়।

তখন শহীদরা বুঝতে পারে কিছু না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ওই ভাবে প্রশ্ন করতেই থাকবেন।

তখন তারা বলবে, 'হে আল্লাহ, আমাদের দেহে ফের প্রাণ দাও। আবার আমরা তোমার জন্যে যুদ্ধ করে শহীদ হই।'

কিন্তু মৃত্যুর পর আর দুনিয়াতে আসা যায় না।

আল্লাহতায়ালা নিয়মকে ভাঙেন না।

আবদার রক্ষা করা হয় না। (মুসলিম)

হাদিস শরীফে এসেছে পাপিষ্ঠ লোকের মৃত্যুর সময় এলে আল্লাহ তায়ালা জাল্লাজালালুহু আম্মান আওয়ালুহু আজরাইল আলাইহিস সালামকে ডাকেন। আদেশ দেন, 'যাও, আমার দুশমনের কাছে। তার আত্মা বের করে আনো। আমি দুনিয়াতে তাকে যাবতীয় সুখের সামগ্রী দিয়েছি তবু সে পাপের কাজ থেকে ফিরে নাই। আজ তাকে শাস্তি দিব।'

আজরাইল আলাইহিস সালাম তার ভয়ানক মূর্তি ধারণ করে। বারোটি ভয়াল চোখ নিয়ে বিকট রূপে সে আসে। তার হাতে থাকে জাহান্নামের আগুনের তৈরি কাঁটাভরা লোহার মুগুর। সাথে রয়েছে পাঁচশো ফিরিশ্‌তা। তাদের রুদ্র মূর্তি, হাতে প্রজ্বলিত আগুনের চাবুক। আর তামার জ্বলন্ত টুকরো। আগুনের ফুলকি।

আজরাইল আলাইহিস সালাম এসেই তাকে কাঁটাভরা চাবুক দিয়ে পেটাতে থাকে। মুমূর্ষ মানুষটির শিরা উপশিরায় কাঁটাগুলো ঢুকে যায়। বাকী ফিরিশ্‌তারা তার মুখে আর পাছায় চাবুক মারতে থাকে। লোকটি বেহুঁশ হয়ে যায়। তারা তার রুহকে আঙুলের মাথা থেকে টেনে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত আনে। এবার পেটাতে থাকে।

তারপর গোড়ালি থেকে হাঁটু, সেখান থেকে জায়গায় জায়গায় বন্ধ করে দেয়। পিটাতে থাকে।

এবার ফিরিশ্‌তারা সেই জ্বলন্ত তামার টুকরা আর আগুনের অঙ্গারগুলো তার থুতনির নিচে রাখে।

আজরাইল আলাইহিস সালাম বলেন, 'হে অভিশপ্ত আত্মা। বের হও। দোজখের দিকে চলো।'

আত্মা শরীর ছেড়ে বের হয়ে আসে।

সে শরীরের উদ্দেশে বলবে, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে শাস্তি দান করুক। তুমি আমাকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করেছো। ইবাদাতে তুমি ছিলে অলস। উদাসীন।

তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছো আর আমাকেও শেষ করে দিয়েছো। শরীরও উল্টো একই অভিযোগ করবে আত্মার বিরুদ্ধে। জমিনের ওই অংশ তাকে অভিশাপ দেয় যেখানে সে গোনাহের কাজ করতো।

ওদিকে শয়তানের সাথীরা দৌড়ে যায় তার কাছে। খুশির খবর শোনায়। অমুকের পুত্র অমুককে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছি।

ইবলিস বিগলিত হয়।

নতুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে নির্দেশ দেয়।

বলা হয় মৃত্যুকষ্টে পাপিষ্ঠের পিপাসা হয়।

সাত সাগরের পানি এনে দিলেও তার তৃষ্ণা মেটে না।

'আর মৃত্যুর কষ্ট সত্যিই এসে যাবে; এই সেই সত্য যা থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াতে।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন--

'যদি তোমরা দেখতে যখন ফিরিশ্‌তারা অবিশ্বাসীদের প্রাণ কেড়ে নেয়। তারা মুখে আর পিঠে আঘাত করতে থাকে। এখন প্রজ্জ্বলিত শাস্তির মজা চেদে নাও।'

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সময় এক লোক তার নিজের ধনী চাচাকে হত্যা করলো। নিহত লোকটির পরিবারের লোক এসে এই অভিযোগ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের কাছে করলেন।

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সব শুনলেন।

বললেন, 'যাও, একটা গরু জবাই করো। তার একটা গোশতের টুকরো নাও। সেটা দিয়ে আঘাত করো মরা মানুষটাকে। তখন দেখো কি হয়।'

আত্মীয়রা তাই করলো।

আর আশ্চর্য!

গোশতের টুকরো দিয়ে আঘাত করার সাথে সাথে মৃত লোকটি প্রাণ ফিরে পেল। সে বলে দিল হত্যাকারীর নাম।

আল্লাহতায়ালা বলেন--

'তোমরা একজন মানুষকে হত্যা করে তা নিয়ে বিরোধ করছিলে। তোমরা তা গোপন করছিলে। আমি তা প্রকাশ করে দিলাম। আমি বললাম তার একটা টুকরো দিয়ে আঘাত করো তাকে; এমনি করেই আল্লাহ মৃতকে প্রাণ দেন। আর নিদর্শন গুলো দেখান। যাতে তোমরা বুঝতে পারো।'

এভাবেই মৃত্যুর পর কবরে শুরু হবে আরেক জীবন।

হাদিসে এসেছে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি জানতে মরণের পর কি দেখবে তাহলে কখনো পেট পুরে খেতে পারতে না। আরামের জন্যে ঘরে যেতে না। বরং একটা উচুঁ জায়গায় বসে বুক চাপড়ে কাঁদতে।'

পবিত্র ইঞ্জিলে সোলায়মান আলাইহিস সালাম উপদেশ দিচ্ছেন এভাবে-

'আমি দেখলাম নিজে পূণ্য কাজে আনন্দ করা ছাড়া মানুষের আর কোথাও কোনো কল্যাণ নেই; আর এটাই তার পাওনা। মানুষের মরণের পর যা ঘটবে কে তাকে এনে তা দেখাবে?'

(বাইবেল-উপদেশক।৩/২২)

বোঝা যায় কবরের জীবন সম্পর্কে সব ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়েছে।

গীতা সংহিতার ১১৬ পৃষ্ঠার ৩,৪,৫,৫ ও ৭ নম্বর শ্লোক-এ তার কথা রয়েছে।

৩ মৃত্যুর রশি আমাকে ঘিরে নিল। পাতালের কষ্ট আমাকে পেয়ে বসলো। আমি ভয়ানক সংকট আর দুঃখে পড়লাম।'

হযরত জায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নাজ্জার গোত্রের একটা পাঁচিল ঘেরা বাগানে খচ্চরের পিঠের ওপর বসে ছিলেন। আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম।

হঠাৎ খচ্চরটা লাফিয়ে উঠলো। আর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটিতে ফেলে দেবার উপক্রম করলো।

দেখা গেল বাগানটিতে পাঁচ কি ছ'টি কবর রয়েছে।

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই কবর বাসীদের তোমরা কি চেনো?'

একজন বললো, 'আমি চিনি, হুজুর।'

হুজুর বললেন, 'এরা কবে মরেছে?'

সে বললো, 'শিরকের জামানায়।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষণ্ণ হলেন। তারপর বললেন, 'এই মানবজাতি কবরে পরীক্ষার মধ্যে পড়ে। তোমরা ভয়ে দাফন করা ছেড়ে দেবে নইলে আমি দোয়া করতাম যেন তিনি তোমাদের কবর আজাব শোনায়। যেমন আমি শুনছি।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'অবিশ্বাসীর জন্যে কবরে নিরানব্বইটি সাপ পাঠানো হয়। যারা কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। যদি সে সব সাপ একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাহলে দুনিয়াতে কোনো সবুজ ঘাস জন্মাবে না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনি সালাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'একবার আমি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, মুনকার নাকীরের আগে কোনো ফিরিশ্‌তা কবরে আসে কি?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে ইবনি সালাম, সূর্যের মতো ঝলমলে একজন ফিরিশ্‌তা আসে। তার নাম রুমান। সে মৃত মানুষটিকে জাগায়। আর বলে, তোমার গোনাহ আর সাওয়াব লিখে দাও।'

তখন মৃত মানুষটি অবাক হয়ে বলবে, 'আমি কি দিয়ে লিখবো? কাগজ কলম তো কিছুই নেই!'

ফিরিশ্‌তাটি বলবে, 'আঙ্গুলকে কলম, মুখকে দোয়াত আর থুথুকে কালি হিসেবে ব্যবহার করো।'

মানুষটি বলবে, 'কাগজ কোথায়?'

ফিরিশ্‌তা কাফনের খানিকটা ছিঁড়ে ফেলবে, 'এতে লেখো।'

তখন বান্দা তার সাওয়াব গুলো লিখে দিবে। তারপর পাপের কথা লেখার সময় থমকে যাবে। ফিরিশ্‌তা ধমক দেবে। বলবে, 'ওরে দূরাচার! দুনিয়াতে গুনাহ করতে শরম করে নাই আর আজ আমার সামনে লিখতে লজ্জা হচ্ছে?' এ কথা বলে তাকে মারতে উদ্যত হবে।

মানুষটি বলবে, 'আমাকে মারবেন না। আমি সব লিখে দিচ্ছি।'

এবার ফিরিশতা বলবে, 'আমলনামায় মোহর এঁকে দাও।'

সে বলবে, 'তেমন কোনো কিছু তো আমার কাছে নেই!'

ফিরিশতা বলবে, 'তোমার নখ দিয়ে এই কাজ শেষ করো।'

সে তাই করবে।

তখন ফিরিশতা সেটা তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

তারপর চলে যাবে।

কিয়ামত পর্যন্ত আমলনামাটি তার গলায় থাকবে।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পূণ্যাত্মা শরীর থেকে আলাদা হবার পর ফিরিশতারা সেটা নিয়ে ওপরের দিকে যায়। তখন একদল ফেরেশতার সাথে দেখা হয়ে যায়।

তারা বলে, 'এটা কোন্ পবিত্র আত্মা?'

উত্তরে তারা বলে, 'ইনি অমুকের ছেলে অমুক।'

তারপর প্রথম আকাশে পৌছে যায়। দরোজায় টোকা দেয়।

সেখানের বাসিন্দারা খুলে দেয় দরোজা। জানায় সুস্বাগতম।

এভাবে সাত আসমানে পৌছে।

তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমার এই বান্দার নাম ইল্লিয়্যিনে রাখা কিতাবে লিখে ফিরিয়ে নিয়ে যাও মাটিতে।'

মরদেহের আত্মা যে ওপরের দিকে যায় তা শুধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বলেন নি! অন্য ধর্মগ্রন্থে তার ইশারা রয়েছে।

বাইবেল

১। ইঞ্জিল-মথি ১২/৪৩-৪৪

'আত্মা বলে, আমি যে জায়গা থেকে বের হয়েছি ফের সেখানেই ফিরে যাবো।'

২। 'মানুষের সন্তানের আত্মা ওপরে যায় আর পশুর আত্মা নিচে যায় কে জানে তা? (উপদেশক। ৪/২১)

৩। 'আর আত্মা যার দান সেই ইশ্বরের কাছে ফিরে যায়।'

শ্রী মদ্ভগবদগীতা

'সত্ত্বগুণ যার মাঝে প্রদান তিনি যান ওপর লোকে। রজোগুণ যার প্রধান সে যায় মধ্যলোকে। আর তমোগুণ প্রবল যার সে যায় নিচলোকে।'

নেক্কার লোকের আত্মা ফিরে আসার সাথে সাথে প্রাণ পায়। নামাজ তার ডান দিকে এসে দাঁড়িয়ে যায়। রোজা দাঁড়ায় বামে। কালামে পাকের তিলাওয়াত আর জিকির গুলো মাথার সামনে আসে। জামাতের নামাজের জন্যে যে পা পড়েছিল তা পায়ের দিকে চলে আসে। বিপদে আপদে আর পাপের মোহ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ধৈর্য কবরের একদিকে দাঁড়িয়ে যায়।

এমন সময় কবরের আজাব গলা বাড়িয়ে মৃতকে ধরতে চায়। সে কোনোদিকেই পথ পায় না। ডানদিক দিয়ে ঢুকতে চাইলে নামাজ বাধা দেয়। বাঁ দিকে ঢুকতে চাইলে রোজা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে সব দিকে আটকা পড়ে সে।

সবাই বলে, 'শপথ আল্লাহতায়ালার! এই মানুষটা দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করেছেন। এখন একটু আরাম করতে দাও।'

আজাব আর পথ খুঁজে পায় না।

এভাবে আল্লাহর নেক বান্দাকে চারদিক থেকে তার ইবাদাত ঘিরে রাখে।

এক সময় আজাব ব্যর্থ হয়। ফিরে যায়।

তখন 'ধৈর্য' বলে, 'যদি কোনো ইবাদাতে খুঁত দেখা দিত তখন আমি তাকে বাধা দিতাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি সবাই মিলে প্রতিরোধ করেছো। সফলতার সাথে। আল্লাহ চান তো আমলনামা ওজন দেবার সময় পাল্লার ধারে কাজে আসবো।'

এবার আসে দু'জন ফিরিশতা।

তাদের চোখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

বজ্রপাতের মতো আওয়াজ। গরুর শিঙের মতো তাদের দাঁত।

মুখের নিঃশ্বাস থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। মাথার চুল পা পর্যন্ত নেমেছে। দু' কাঁধের দূরত্ব কয়েকদিনের পথ। দয়া মায়া মমতা তার ধারে কাছেও নাই।

এরা মুনকির নাকির।

তাদের একেকজনের হাতে রয়েছে লোহার হাতুড়ি। ভয়ানক ভারি। সুবিশাল। এতোই বড় যে গোটা সৃষ্টির সব মানুষ আর জ্বিন একসাথে মিলে সেই হাতুড়িকে তুলতে পারে না।

তারা এসে মৃতকে বলে, 'ওঠো, বসে পড়ো।'

হঠাৎ সে বসে পড়ে। তার কাফনের কাপড় মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত খুলে যায়।

মুনকির নাকির প্রশ্ন করে।

মান্ রাব্বুকা?

তোমার প্রতিপালক কে?

ওয়ামা দ্বীনুকা?

তোমার ধর্ম কি?

ওয়া মান্ নাবিউকা?

তোমার নবী কে?

মৃত উত্তর দেয়।

'আমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানুহু।'

আমার ধর্ম ইসলাম।

আমার নবী শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তখন আসমান থেকে বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজ ভেসে আসে। "আমার ক্রীতদাস ঠিক উত্তর দিয়েছে। তার জন্যে বেহেশ্‌তের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে বেহেশ্‌তী পোশাক পরিয়ে দাও। আর বেহেশ্‌তের একটা দরোজা খুলে দাও।"

তাই করা হয়। মাথার দিকে দরোজা খুলে যায়।

তখন স্বর্গ থেকে ভেসে আসে খুশবু। মন জুড়ানো হাওয়া। আর কবরটি চওড়া হতে থাকে। যতদূর তার দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত।" (মেশকাত)

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

ফিরিশ্‌তারা বলবে, 'পায়ের দিকে দেখুন।'

পায়ের দিকে একটা দরোজা খুলে যায়। সেখানে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। জাহান্নাম।

দোজখের শাস্তির অবস্থা দেখবে মৃত।

ফিরিশ্‌তারা বলবে, 'ভয় নেই! হে আল্লাহর বন্ধু। আপনি এর থেকে মুক্তি পেয়েছেন।'

অবর্ণনীয় খুশিতে ভরে যাবে তার মন।

এবার বেহেশ্‌তের দিক থেকে সাতাত্তরটা দরোজা খুলে দেয়া হবে। কেয়ামত পর্যন্ত এমন চলবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর প্রতিটি কবরই এই আশা করে যে তাকে আমার এখানে দাফন করা হোক। (ইবনে আসাফির)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'মুমিনের মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমিন কান্নাকাটি করে। (হাকিম)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত ওমর রাদিয়াআল্লাহু তায়ালা আনহুকে বললেন, 'ওমর! তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমাকে কবরে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসবে? তারপর পরীক্ষা নেয়ার জন্যে তোমার কাছে দু'জন ফিরিশ্‌তা আসবে। যাদের আওয়াজ হবে মেঘের গর্জনের মতো। চোখ হবে দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেয়া বিদ্যুতের মতো।

তারা এসে তোমাকে ধমক দিয়ে কথা বলবে।

বলো, ওমর! তখন তোমার অবস্থা কি হবে?'

উত্তরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল তখন কি আমার জ্ঞান ঠিক থাকবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ এখনকার মতোই থাকবে।'

শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'তাহলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো।'

(তিবরানী)

বদকারের দেহ যখন কবরে রাখা হয় তখন দু'পাশের মাটি এতো চেপে আসে যে তার পাঁজরের হাড়গুলো একে অন্যের মাঝে ঢুকে যায়। দুটো কাল সাপ হাজির হয়। তারা একজন পায়ের দিক থেকে অন্যজন নাক থেকে দংশন করা শুরু করে। ছোবল মারতে মারতে মাঝখানে এসে হাজির হয়। এবার আসে মুনকার নাকির।

ভয়াল মূর্তি তাদের।

তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার প্রতিপালক কে?'

অবিশ্বাসী অবাক। ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, 'হায়! হায়! আমি যে কিছুই জানি না।'

তারা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার ধর্ম কি?'

অবিশ্বাসী চিৎকার করে বলে, 'আমি কিছু জানি না! কিছু জানি না।'

তারা ফের জিজ্ঞেস করে, 'তোমার নবী কে?'

সে বলে, 'আমি কিছু জানি না। আমি কিছু জানি না!'

প্রচন্ড বেগে নেমে আসে সেই মুগুর। যা সব জ্বিন আর মানুষ তুলতে পারে না। সেই আঘাতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আগুনের ফুলকি। সে মরে না!

তাকে বলা হয়, 'উপরের দিকে দেখো।'

সে দেখে বেহেশতের বাগান। তার সৌন্দর্য।

'খোদার দুশমন!' গর্জে ওঠে ফিরিশতারা। 'আল্লাহতায়ালার হুকুম মেনে এলে এই হতো তোর ঠিকানা!'

দয়ার নবী, জগতের মুক্তিদাতা, দো জাহানের বাদশাহ, সারোয়ারে কায়িনাত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শপথ ওই মহান স্রষ্টার যার হাতে আমার প্রাণ ওই অবিশ্বাসী তখন এত বেশি দুঃখ পাবে যা আর সে কখনো পায়নি।'

তারপর তার পায়ের নিচ দিয়ে খুলে দেয়া হবে দোজখের দরোজা। বলা হবে, 'এই হলো তোর ঠিকানা অবাধ্যতার শাস্তি।'

এবার জাহান্নামের সাতাত্তুরটা দরোজা খুলে দেয়া হবে।

নরক থেকে আসবে ধোঁয়া, আগুন আর লু হাওয়া।



দশ

ইমাম আবু এজিদ কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর লেখা বই 'তাজকিরাহ' এ লিখেছেন, 'নবী, রাসুল ও পয়গম্বরদেঁর মৃত্যু হচ্ছে এতটুকু যে, এর মাধ্যমে তাদেরকে শুধু আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নেয়া হয়েছে। আমাদের কাছে তারা হচ্ছে ফিরিশতাদের মতো। ফিরিশতারা জীবিত থাকার পরও আমরা তাদের দেখি না। তেমনি নবী ও রাসূলগণ।'

ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামদেঁর আত্মা নিয়ে ফের ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই শহীদদের মতো তাঁরাও জীবিত।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সব নবীই জীবিত। নিজ নিজ কবরে তারা নামাজ আদায় করছেন।' (আবু ইয়ালা)

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি মিশকাতের শরাহ 'আশিয়াতুল লুমআত' কিতাবে লিখেছেন-

"সব নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম মৃত্যুর পর জীবিত থাকার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। সবার একই মত। আর এটা আধ্যাত্মিক নয় জাগতিক। ঠিক দুনিয়ার মতো।"

হযরত ইবনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমরা একবার রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা আর মদিনার মাঝামাঝি এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম।'

পথে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, 'এটা কোন্ উপত্যকা?'

'আরজাক।' আমরা জবাব দিলাম।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি এখন হযরত মুসা নাবী আনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে দেখছি!'

একথা বলে তিনি তার গায়ের রঙ আর মাথার চুলের বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি এখন দু'কানে দু'আঙুল ঢুকিয়ে আল্লাহর নাম নিচ্ছেন। উঁচু আওয়াজে। আর এই উপত্যকা পার হচ্ছেন।'

হযরত ইবনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে আরো একটা উপত্যকা দেখতে পেলাম।'

আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন উপত্যকা?'

আমরা বললাম, 'হারশা।'

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি একটা লাল রঙ উটের পিঠে বসে। আল্লাহর নাম উঁচু স্বরে পড়ছেন। আর পথ পেরুচ্ছেন। তাঁর গায়ে পশমের জোব্বা। হাতে গাছের ছাল দিয়ে তৈরি উটের লাগাম।' (মুসলিম)

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম গণ মৃত্যুর পর হজ্ব পালন করেন। তাঁদের দেখা যায়।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত মুসা, ঈসা আর ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছি। এর মাঝে নামাজের সময় হয়ে গেল। আমি তাঁদের ইমামতি করলাম।'

ইমাম মালেক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হযরত আমর ইবনে জামুহ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনি আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুদের কবর বন্যার তোড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

তাঁর দুজন হচ্ছেন আনসারী সাহাবী অহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। দুজনকে একই কবরে রাখা হয়েছিলো। অন্য জায়গায় নেবার সময় কবর খোঁড়া হলো। দেখো গেল যে তাঁদের দেহ একটু ও বদলায়নি। মনে হচ্ছে গতকাল মারা গেছেন।

ঘটনাটি ছিলো তাঁদের শহীদ হবার ছেচল্লিশ বছর পর।

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন কালো।

তিনি পবিত্র মদিনায় খাল খোঁড়া শুরু করেছিলেন। অহুদের কবরস্থানও এর আওতায় পড়ে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যার যার আত্মীয়দের লাশ অন্য কোথাও সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

কবর গুলো খোঁড়া হলো।

সবকটি লাশ সজীব। অক্ষত।

কোনো কিছু বদলায়নি।

খোঁড়ার সময় হযরত আমীর হামজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পা মুবারাকে কোদালের ঘা লাগলো সাথে সাথে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত। তাজা!

অহুদ লড়াই শেষ হয়েছে এর পঞ্চাশ বছর আগে।

বাগদাদ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে সালমান পার্ক। পুরো শহর। আগের নাম ছিলো। মাদায়েন। একটা কবরস্থান।

হযরত সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবর রয়েছে এখানে। তার পাশে রয়েছে আরো দু'জন সাহাবীর কবর। হুজায়ফাতুল ইয়েমিনী আর হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ।

শহর থেকে পোয়া মাইল দূরে তাঁদের কবর।

জায়গাটা অনাবাদী।

উনিশশো বত্রিশ সাল।

রাত গভীর।

স্বপ্ন দেখছেন ইরাকের বাদশা প্রথম ফয়সাল।

হুজায়ফাতুল ইয়েমেনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, 'আমাদের দু'জনকে দজলা নদী থেকে দূরে কোথাও দাফন করো। আমার কবরে পানি ঢুকেছে। যাবিরের কবর স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে।'

ঘুম ভেঙে গেল বাদশার।

সারাদিন নানা রাজকর্মের মাঝে ভুলে গেলেন স্বপ্নটির কথা।

আবার এলো রাত।

এবার বাদশা নয়। স্বপ্ন দেখছেন ইরাকের মুফতিয়ে আজম।

সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একথাও বললেন যে গত দু'রাত ধরে তিনি বাদশাকে জানাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কোন গুরুত্ব দেননি।

ঘুম ভেঙে গেল মুফতি সাহেবের।

তিনি অস্থির। ভোর হতেই দেশের প্রধান মন্ত্রী নুরউস সাইদ পাশাকে সাথে নিয়ে বাদশার সাথে দেখা করলেন। স্বপ্নের কথা জানালেন। বাদশাও বললেন, তিনি দু'দিন ধরে এমন স্বপ্ন দেখছেন। তারপর বাদশা বললেন, 'মুফতি সাহেব, আপনি ফতোয়া দেবেন কবর খোলার ব্যাপারে?'

মুফতি সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ।'

বাদশা বললেন, 'সেক্ষেত্রে কবর সরাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

ফতোয়া দিলেন মুফতি সাহেব। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে।

খবরের কাগজে ফতোয়া আর শাহী ফরমান ছাপা হলো।

পবিত্র ইদুল আজহার দিন যোহরের পর কবর খুলে অন্য জায়গায় সরানো হবে।

বিদ্যুৎ বেগে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো এই খবর।

আল্লাহ পাকের অপার মহিমা!

এ সময় সারা দুনিয়ার ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র হজ্ব পালন করতে মক্কা ও মদিনায় এক হয়েছেন।

হাজীরা বাদশার কাছে অনুরোধ করলেন এই কাজটি যেন হজ্ব শেষ হবার ক'টা দিন পরে করেন। তাতে তারাও হাজির হবার সুযোগ পাবেন।

এ ব্যাপারে তাদের বিপুল আগ্রহ দেখে সরকার রাজী হলেন।

ঠিক হলো পবিত্র হজ্ব শেষ হবার দশ দিন পর ওই পবিত্র কাজ করা হবে। গোটা দুনিয়ার লোক চিঠি আর তারবার্তা পাঠালো। রাশিয়া, বুলগেরিয়া, ইরান, আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, লেবানন ও অন্য সব দেশের মানুষ এই পবিত্র কাজের সময় থাকার আবেদন জানালো।

আর ওদিকে কবরে যাতে পানি না ঢোকে সেজন্য ব্যবস্থা নেয়া হলো।

সেদিন ছিল সোমবার।

দুপুর বারোটা।

লাখ লাখ লোকের উপস্থিতিতে খুলে ফেলা হলো কবর দুটি।

সত্যিই তাই। যা স্বপ্নে বলা হয়েছিলো।

খানিকটা পানি ঢুকেছে হুজাইফাতুল ইয়েমেনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবরে। হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবর খুবই স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে।

অথচ নদী দজলা থেকে প্রায় দুফার্লং দূরে রয়েছে কবর দুটো।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এসেছেন।

রয়েছেন ইরাক সরকারের সভাসদরা।

আর বাদশাহ ফয়সাল নিজে।

প্রথম হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র লাশ ক্রেনের সাহায্যে উপরে ওঠানো হলো।

আল্লাহর অপার মহিমা!

মনে হলো যেন লাশ আপনা আপনি ক্রেনের স্ট্রেচারে উঠে এলো।

ক্রেন থেকে স্ট্রেচার নামানো হলো। লাশসহ।

কাঁধে নিলেন মিশরের ভাবী সম্রাট যুবরাজ ফারুক। তুরস্কের একজন মন্ত্রী, ইরাকের মুফতিয়ে আজম ও বাদশাহ ফয়সাল। অত্যন্ত সমাদরে একটা কাঁচের তাঁবুতে রাখা হলো পবিত্র লাশ।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লাশ মুবারাক বের করা হলো।

দুটি পবিত্র লাশ।

কাফন ঝকঝকে। নতুন।

মনে হচ্ছে গতকাল দাফন করা হয়েছে। এমনকি দাড়িগুলোতে কালের কোনো চিহ্ন ফোটেনি। চুল গুলো খোলা।

চেহারা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো।

চোখ ঝলসানো দীপ্তি।

অনেকে চোখের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। এতো বেশি প্রভা!

অনেক বড় বড় চিকিৎসক এসেছিলেন।

তারা অবাক।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্মান আই স্পেশালিস্ট অভিভূত। মৃত দেহের চোখ এতো সজীব। এতো আলো!

আত্মহারা হয়ে মুফতিয়ে আজমের হাত ধরে ফেললেন।

বললেন, 'ইসলাম যে সত্য এর চেয়ে বেশি আর কি প্রমাণ হতে পারে! আমি মুসলমান হচ্ছি।'

ক্লোজ সার্কিট দূরদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল এক জার্মান কোম্পানী।

তাতে গোটা কার্যক্রম দেখার সুবিধে হয়েছিল।

পবিত্র লাশ দুটোকে প্রাচীন কবরস্থানে সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কবরের পাশে দাফন করা হলো।

এ ঘটনা দেখে অনেক ইহুদী, নাসারা মুসলমান হয়ে গেল।

আল্লাহতায়ালা এ মহা রহস্যময় ঘটনার ব্যাখ্যা তো আগেই

কালামে পাকে দিয়েছেন-

'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা জানো না।'

আরো বলেন-

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত ধারণা করো না। তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা রুজি পায়।'

মানুষ মরে না।

শুধু পরিবর্তন হয়।

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

'বদরের যুদ্ধের দিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন চব্বিশজন কুরাঈশ সর্দারকে একটা পচা কুয়ার মধ্যে ফেলে দিতে। তাঁর একটা নিয়ম ছিল যুদ্ধে জয়লাভ করতে তিনদিন পর্যন্ত ওই ময়দানে থাকতেন। বদরের প্রান্তরের তিন দিন শেষ হলো।'

তিনি উট তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তাঁর জিনিস পত্র ওঠানো হলো। এরপর তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। সাহাবীরা তাঁর পেছনে চললেন। তাঁরা ভাবলেন হয়তো তিনি কোনো কাজে যাচ্ছেন।

একসময় তিনি সেই কুয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ডাকতে শুরু করলেন।

'হে অমুকের পুত্র অমুক! এখন কি তোমার মনে হচ্ছে না আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানা তোমাদের জন্য ভালো হতো?

কি, আল্লাহতায়ালা যা ওয়াদা করেছিলেন তা দেখতে পাচ্ছো? তিনি যা ওয়াদা করেছিলেন আমরা তা সত্য দেখতে পাচ্ছি।'

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো মরা লোকদের সাথে কথা বলছেন!'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'শপথ তাঁর যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমাদের চেয়ে বেশি শুনছে তারা।'

মুহাম্মাদ ইবনি মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমার মা'র মৃত্যু হলো। তার জন্যে কবর খুঁড়লাম। তখন অন্য একটা কবর ফাঁক হয়ে গেলো। দেখি মৃত মানুষটির কাফনের কাপড় ধবধবে সাদা। একটা ফুলের ঝাড়। ঝুলে আছে।

এই ফুলের খুশবু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা খোলা জায়গাটা বন্ধ করে দিলাম।'

সাবেত বানানী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে যারা দাফন করতে গিয়েছিলো তারা বলেন,

'অসাবধানতার কারণে কবরের একটা ইট খুলে গেল। আমরা দেখি, দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন সাবেত বানানী।'

হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম। তাঁর উম্মতকে দিন রাত দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আল্লাহর পথে। আল্লাহর দিকে। বছরের পর বছর চলে গেল। সত্য মেনে নিল না।

তখন এই ঘোর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দোয়া করে দিলেন।

'হে আল্লাহ! কে সত্য আর কে মিথ্যা তুমি তার মীমাংসা করে দাও।'

এক ভয়ানক আজাব নেমে এলো।

বিরতিহীন ধ্বংস ধ্বনি, অবিরাম ভূমিকম্প আর উপর্যুপরি আগুনের শিখার তলায় তলিয়ে গেল জাতি। কাওমে শোয়াইব।

তখন এক ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন--

'হায় হতভাগা জাতি! তোমাদের কল্যাণের জন্যেই আমি শুনিয়েছিলাম আল্লাহর বাণী। তোমাদের ভালোর জন্যেই শোনাতাম সত্য উপদেশ। কিন্তু তোমরা তা শুনলে না। ডেকে আনলে অমঙ্গল। আর ধ্বংস হয়ে গেলে। আমি আর তোমাদের জন্যে কি দুঃখ করবো। তাতে লাভই বা কি?' (সুরা আরাফ, আয়াত ৯১-৯৩)

হযরত আবু নসর নিশাপুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একবার একটা কবর খুঁড়লাম। তাতে পাশের কবরের খানিকটা খুলে পড়লো। দেখি সেখানে একজন তরুণ কালামে পাক হাতে নিয়ে মন উদাস করা সুরে তিলাওয়াত করছে।'

আমাকে দেখলো।

জিজ্ঞেস করলো, 'আবু নসর, মহাপ্রলয় হয়েছে?'

আমি বললাম, 'না।'

'আমার কবরের খোলা জায়গাটা বন্ধ করে দিন।' সে বললো।

হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'যখন মুমিনের লাশ কবরে রাখা হয় তখন সে মনে করে সূর্য ডুবছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে। বলে, আমাকে ছাড়ো, আমি নামাজ পড়বো।'



এগারো

হাশরের দিন।

হাশরের দিন বড় কঠিন দিন।

'কাল্লা ইজা দুক্কাতিল আরদু দাক্কান দাক্কা-'

'যেদিন জমিনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। ভেঙে ফেলা হবে।'

'ওয়াজা রাব্বুকা ওয়াল মালাইকাতু সাফকান সাফফা'

'আল্লাহ আসবেন; সাথে ফিরিশ্‌তা। কাতারে কাতার।'

ইয়াওমা ইয়াখরুজুনা মিনাল আজদাসি ইসতারাআ-'

'যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। দ্রুতগতিতে।'

অনুফিখা ফিস সুরি ফা ইজাহুম মিনাল্‌ আজদাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানশিনুল-'

'যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে। আর দলে দলে মানব তার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসবে।'

'ক্বাল্লু ইয়া ওয়ালানা মাম্‌ বাআসানা মিম মারক্বাদিনা হাজা মা ওয়াদার রাহমানু অয়াসাদাকাল মুরসালুন'

'তারা বলবে, আজকের দিন কোন্‌ দিন? বলা হবে, এই সেই দিন যেদিন সম্পর্কে সমস্ত নবী ও রাসুলগণ সতর্ক করেছিলো।'

'সেদিন তোমাদের দৃষ্টি হবে নত; চেহারায় নামবে বিষাদ-'

'কেউ কারো খোঁজ নেবার নেই।'

'যেদিন দুধ পান কারিণী মা ভুলে যাবে তার বাচ্চাদের।'

বড় কঠিন দিন।

ভয়ঙ্কর। সেদিন। আল্লাহ পাক মহান আরশে বসা। প্রকাশ্যে আমরা তাঁর চোখের সামনে। আল্লাহ আজ সরাসরি বলবেন। আর আমরা শুনবে।

হাদিসে পাকে আছে।

আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বনি আদম! জীবন দিয়েছিলাম, সম্পদ গিয়েছিলাম, বুদ্ধি দিয়েছিলাম। বলো আজ কী নিয়ে এসেছো?'

'কী করে এসেছো, বলো?'

এক বড় ভয়াবহ দিন।

আমার ভায়েরা, মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় এমন ভয়াল বিভীষিকাময় দিন।

সামনে দাঁড়িপাল্লা। পেছনে মানব।

চারদিকে ফিরিশ্‌তা। কাতার বন্দী।

দাঁড়িপাল্লার সামনে জাহান্নাম ফুঁসছে। ফুলছে।

'এই সেই জাহান্নাম। প্রবেশ করো।'

'জাহান্নাম ফুঁসছে, ফুলছে। রাগে ফেটে পড়ছে।'

ডানে বাঁয়ে আমলের সারি। ওদিকে তাকাও। আমাল। এদিকে দেখো! আমাল।

ওপরে মহান প্রভু আল্লাহর আরশ। চারদিকে ফিরিশতাদের পাহারা।

দাঁড়িপাল্লার কাঁটা মাঝামাঝি।

আমাল নিয়ে আসছে।

বান্দা জানে না। কোন্‌ দিকে ঝুঁকবে আজ কাঁটা। ডান দিকে না বাঁদিকে। এই সেই সময় যখন একে ভুলে যাবে অন্যকে।

এই সময় সম্পর্কে খবর দিয়েছেন আমাদের নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কে হবে সেদিন ব্যর্থ?

যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হয়েছে। সে ব্যর্থ।

জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাব্‌না ফুলানিন ক্বাদ খাফ্‌ফাত মাওয়াজিনুহু; ওয়া শাকিয়া শাকাআন লা ইয়াশআদ বা'দাহু আবাদা।

'অমুকের ছেলে অমুকের নেকী কম হয়ে গেছে। সে ব্যর্থ। সে আর কখনো সফল হবে না।'

এই ঘোষণার পর জাহান্নামের আগুন ফুঁসে উঠবে।

'শারাবি লাহুম মিন কাতিরান।'

'পাপিষ্ঠকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে।'

'ওয়া তাখ্‌শা ওজুহুমুন্‌ নার।'

'তাকে আগুনের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে।'

আর জাহান্নামের উচ্ছ্বসিত আগুনের ঢেউয়ের মাঝে ফেলে দেয়া হবে। এখানে থেকে সে আর কখনো বের হতে পারবে না। কোনো পথ পাবে না নিস্তারের। সে চিৎকার করবে। ভয়ার্ত আর্তনাদ। সে বাঁচতে চাইবে এই নিদারুণ কষ্ট থেকে।

সে সাপ দেখবে।

দেখবে বিচ্ছু।

একটা সাপ উটের গর্দানের চেয়ে মোটা।

একটা বিচ্ছু গাধার মতো।

সে দেখবে আগুন। লেলিহান শিখা।

যা অবিশ্বাস করেছিলো সবই দেখতে পাচ্ছে।

তার পিপাসা নিবারণের পানি দেখতে পাচ্ছে।

রক্ত পুঁজ মেশানো পানি। ফুটছে। টগবগ করে। হামীম।

তার খাবার দেখতে পাচ্ছে। কাঁটাভরা শিকড়। যা কণ্ঠায় আটকে যায়। যাক্কুম।

তার আর মৃত্যু নাই।

অনন্তকাল। চিরদিন।

জ্বলবে, পুড়বে। সে আর্তনাদ করবে। বিরতিহীন।

সে কাঁদবে। অবিরাম। তার চোখ দিয়ে বের হবে রক্ত। পুঁজ। সে ভয়াবহ আজাব থেকে বাঁচতে চাইবে।

সে চিৎকার করবে।

আহত পশুর মতো।

তার চিৎকার বাড়বে। বেড়েই চলবে।

তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'মালিক (জাহান্নামের দারোগা), তালা লাগিয়ে দাও। যেন বাইরের চিৎকার ভেতরে আর ভেতরের চিৎকার বাইরে না আসে।'

'এর জন্যে আগুনের বিছানা বিছাও।'

'এর ওপর আগুনের কম্বল বিছাও।'

ওপরে আগুন।

নিচেও আগুন।

ওদিকে দরোজায় তালা দেয়া।

এই মানুষ ব্যর্থ।

সফল কে?'

সাফল্য পেয়েছে কে?

কে কামিয়ার হয়েছে?

যার নেকীর পাল্লা ভারি হয়েছে।

'ফামান সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ফা-উলাইকা হুমুল মুফলিহুন।'

'যার নেকী বা পূণ্য বেশি হয়েছে তিনি পেয়েছেন সফলতা।'

জিব্রাইল আমিন ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাবনা ফুলানিন ক্বাদ সাকুলাত মাওয়াজিনুহু ওয়া শায়িদা শাঈদাতান লা ইয়াশকা আবাদাহা আবাদা।'

অমুকের ছেলে অমুকের পূণ্য বেশি হয়েছে। পাল্লা ভারি হয়েছে। সে সফল হয়েছে। সে কামিয়াব। আর কখনো সে ব্যর্থ হবে না। তার সফলতা চিরদিনের। চিরকালের। অনন্ত।

এই ঘোষণার সাথে সাথে তার কাঁধ আদম আলাইহিস সালামের মতো সাত হাত উঁচু হয়ে যাবে। চওড়া হবে সাত হাত। সৌন্দর্য হবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো। দাউদ আলাইহিস সালামের মতো কণ্ঠস্বর হবে। আইউব আলাইহিস সালামের মতো পাবেন অন্তর। ঈসা আলাইহিস সালামের মতো বয়স আর দেহ সৌষ্ঠব পাবেন। শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো চরিত্র পাবেন।

ছয়জন নবী আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের গুণাবলী তার মাঝে প্রবেশ করবে। এক পলকে। দুনিয়া থেকে গিয়েছিল পাঁচ ফুট দেহ নিয়ে। সবার সামনে ঘটবে তার শরীরের পরিবর্তন। যেমন ক্রেন কোনও জিনিষকে ওঠায় তেমন সবার দৃষ্টির সামনে বেহেশতী, সফলকাম মানুষটির কাঁধ উঁচু হতে থাকবে।

গোটা হাশরবাসী দেখবে এই দৃশ্য।

তারা বলবে, 'ওই যে একজন মুক্তি পেল! ওই যে একজন সফল হলো। ওই যে একজন কামিয়াব হয়ে গেল।'

পাঁচটা আরো গুণ প্রবেশ করবে জান্নাতির ভেতর।

চেহারা ফর্সা আর লালিমা মাখা হবে। দেহের সমস্ত পশম অদৃশ্য হয়ে যাবে। চেহারায় দাড়ি আর থাকবে না।

চোখে সুরমা দেয়া হবে।

মাথার চুল কোঁকড়ানো হয়ে যাবে।

মোট এগারোটা পরিবর্তন আসবে।

আল্লাহ বলবেন, 'এখন আমার বান্দাকে বেহেশতী পোশাক পরাও।'

একশো জোড়া বেহেশতী পোশাক পরানো হবে।

আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দেবেন, 'আমার বান্দাকে বেহেশতী মুকুট পরাও।'

সাথে সাথে পরানো হবে জান্নাতের মুকুট। যার মাঝে শোভা পাবে সত্তরটা ইয়াকুত পাথর। তার একটা দুনিয়াতে রাখলে গোটা বিশ্বজগত চোখ ঝলসানো আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে।

'ওয়া-ইয়ানকালিবু ইলা আহ্‌লিহি মাশরুবা।'

'এখন যাও ময়দানে মা-হাশরে। তোমার লোকজনের কাছে। (তারা দেখুক তোমার সম্মান!)'

'কে তুমি?' লোকেরা জিজ্ঞেস করবে।'

'আমি অমুকের পুত্র অমুক,' বেহেশতী বলবে।

'তুমি এতো আলো কোথায় পেলে? গোটা হাশরের মাঠ আলোকিত করে দিয়েছো?'

'আমার দয়ালু প্রভু মাফ করে দিয়েছেন আমার পাপ। আমাকে আলো দিয়েছেন। আর সম্মান। আর বেহেশ্‌ত!'

'আমাকে চেনো না?' সে বলবে, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক। আমি অমুক পাড়ার। অমুক বংশের। অমুক যুগের। হ্যাঁ, মহান প্রভু আমাকে করেছেন সৌভাগ্যবান। আমি পেয়েছি সফলতা। চিরদিনের।' 'হা-উ মুক্‌রিউ কিতাবিয়া-এসো আমার কিতাব (আমলনামা) পড়ো।'

'ইনি জানান্‌তু আন্নি মুলাকিন হিসাবিয়া।'

'আমার বিশ্বাস ছিল একদিন হিসাব নেয়া হবে।'

এমন সময় আওয়াজ আসবে।

'ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া।'

'এ উঁচু (সম্মানিত) জীবনের অধিকারী হয়েছে।'

'ফি জান্নাতিন আলীয়া।'

'জাঁকজমকপূর্ণ, মর্যাদাশীল বেহেশতের মালিক হয়েছে।'

'ওয়া তুফুহা দানিয়া।'

'যেখানে ঝুলন্ত রয়েছে ফলগাছের ডাল পালা।'

বেহেশ্‌তে আঙুরের একটা বীথি এতো বড় হবে যে, এক বছর ধরে একটা কাক একটানা উড়লেও তার সীমানা শেষ করতে পারবে না। এমন আঙুর গুচ্ছ জান্নাতে মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন আল্লাহ তায়ালা।

'কুলু আশরাবু বিমা আফ্‌লাতু ফি আইয়ামিল খালিয়া।'

'এখন খাও, পান করো; দুনিয়াতে পরিশ্রম করেছিলে তার প্রতিফল ভোগ করো।'

এখন ঘোষণা দেয়া হচ্ছে-

'ইন্না লাকুম আন্‌ তান্‌নামু ফালা তাসআলু আবাদা-'

'সুস্থ থাকো। আর কখনো অসুস্থ হবে না।'

'ইন্না লাকুম আন্‌ তাসিব্বু ফালা তাহরামু আবাদা-'

'চিরকাল যুবক থাকো। আর কখনো বুড়ো হবে না'।

এই হচ্ছে সফলতা।

চূড়ান্ত পরিণতি।

কেমন করে শুরু হলো হাশরের মাঠ?

তিনটি ফুঁ এর পর।

কার ফুঁ?

হযরত ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের।

পয়লা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন-

'ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের গোটা শরীরে অগণিত পাখা। জাফরানি রঙের। তার প্রতিটি পশমে হাজার হাজার মুখ। প্রতিটি মুখে হাজার জিভ। প্রতিটি জিভ অসংখ্য ভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে যাচ্ছে।

ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছেন।

প্রতি দমে তৈরি হচ্ছে একটা ফিরিশ্‌তা। সে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর গুণগান করতে থাকে।'

আবু শাইক ও আবু নাঈম হুলিয়াতে বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আরশ বয়ে নেয়া ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম।

আরশের একটা খুঁটি তার কাঁধের ওপর। তার দু'পা সাত জমিন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তার মাথা উঠেছে সাত আসমানের ওপর।'

শায়খ আবু আওজায়ী থেকে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মাঝে ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের চেয়ে বেশি সুন্দর কণ্ঠস্বর আর কারো নেই। তিনি যখন তাসবীহ পড়া শুরু করেন তখন আকাশবাসিরা তাদের তাসবীহ পড়া আর সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ সে সময় তারা শোনাতে মগ্ন।'

শিঙ্গার তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম।

মহান আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন আকাশ ও মাটির মাঝে যে দূরত্ব তার চেয়ে সাতগুণ, তার মানে, পঁয়ত্রিশ শত বছরের রাস্তা সমান চওড়া করেছেন লাওহে মাহফুজকে। একে সাজিয়েছেন মহামূল্যবান মনি ও মুক্তা দিয়ে। তারপর তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আরশের সাথে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব তাতে লিখে রেখেছেন।

হযরত ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের পাখা মাত্র চারটে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাখা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তিন নম্বর পাখার ওপর তিনি নিজেই বসে রয়েছেন। আল্লাহর ভয়ে ও লজ্জায় তিনি চার নম্বর পাখা দিয়ে নিজ মুখ ঢেকে রেখেছেন। প্রবল পরাক্রান্ত মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে তিনি এতই ভীত আর লজ্জিত যে আরশের খুঁটি জড়িয়ে ধরে নিজ পাখায় মাথা ঢেকে নিচু হয়ে পড়ে আছেন। তাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা পাখির মতো।

ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম মুখের পর্দা শুধু তখন সরান যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর আদেশ নিষেধ জারি করেন। সে সময় লাওহে মাহফুজে আল্লাহর হুকুম প্রতিফলিত হয়।

তিনি আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে কাছের।

তবু তাঁর ও আরশের মাঝে সত্তর হাজার পর্দার আড়াল। একটা পর্দা থেকে আরেকটি পর্দার দূরত্ব পাঁচশো বছরের রাস্তা।

হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম থেকে ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের মাঝে রয়েছে সত্তর হাজার পর্দার আড়াল। একটা পর্দার চেয়ে অন্যটি পাঁচশো বছর দূরে।

ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম তাঁর ডান উরুর ওপর শিঙা রেখে তার গোড়া মুখে লাগিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহর আদেশের। কখন তিনি আদেশ দেবেন। তিনি হুকুম দেয়া মাত্রই ফুঁ দেবেন সজোরে।

দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আদেশ আসবে তাঁর কাছে। চারটা পাখা এক করবেন শরীরের সাথে। তারপরই ফুঁ দেবেন। ওই সময় আজরাইল আলাইহিস সালাম সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাঁর এক হাত থাকবে সাত জমিনের নিচে। আরেক হাত থাকবে সাত আসমানের ওপর। যাবতীয় প্রাণীর জীবন ছিনিয়ে নেবেন তিনি তখন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বলা হয়েছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের শিঙ্গায় চারটে শাখা তৈরি করেছেন। দুটো শাখা দুনিয়ার পূর্বে ও পশ্চিম কিনার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একটা শাখা জমিনের নিচে। অন্যটি সাত আসমানের উপরে ওঠে গেছে। তাঁর শরীর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র। আত্মার স্তর হিসেবে ওগুলো আলাদা ধরনের।

নবীদের একরকম, সাধারণ মানুষের এক ধরন, জ্বিনদের জন্যে ফের আলাদা। শয়তানের জন্যে ভিন্ন। পোকা মাকড়, জীব জানোয়ারের জন্যে আলাদা।

মসনাদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী থেকে আবু হুযাইফা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর হাদীসে পাক জানা যায়।

হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, শিঙায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে মানুষের কি অবস্থা হবে?'

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হুযাইফা! আমার আত্মা যাঁর হাতে তাঁর শপথ! শিঙা বাজানোর সাথে সাথে কিয়ামত ঘটে যাবে। এমন অবস্থা হবে যে মুখের কাছে ওঠানো লোকমা গিলে ফেলার ক্ষমতা থাকবে না। হাত থেকে পড়ে যাবে। পোশাক সামনে থাকবে পরার অবকাশ পাবে না। পানির পেয়ালা সামনে থাকবে কিন্তু তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না। বড় বিপদজনক, বড় ভয়ঙ্কর সময়।'

এটা হচ্ছে প্রথম ফুঁ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারপর যেদিন সেই প্রলয় ধ্বনি হবে। সেদিন মানুষ তার ভায়ের কাছ থেকে পালাবে। আর তার মা বাবা। আর তার সঙ্গিনী ও সন্তান থেকে। সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল, হাসি খুশি আর 'আনন্দিত হবে। আর অনেক মুখ ধূলি ধুসরিত, মলিন, কালো আর বিষাদ মাখা হবে। এরাই অবিশ্বাসী, পাপিষ্ঠ।' (সুরা আবাসা ৩৩-৪২ আয়াত)

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন,

'যখন ভূপৃষ্ঠ প্রবল ভাবে কাঁপতে থাকবে। দুনিয়া তার ভেতরের জিনিস উগরে দিবে। মানুষ বলবে কী হয়েছে পৃথিবীর? (সুরা জিলজাল ১-৪ আয়াত)

আরো বলেন . . .

যেদিন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে। আর সবাই তা অনুসরণ করবে। যেদিন হৃদয়গুলো স্পন্দিত হবে। আর নত হবে আঁখিগুলো নত হবে।' (নাজিয়াত ৬-৭)

ওই ভয়াবহ, ভয়াল দিন সম্পর্কে অন্য সব ধর্মগ্রন্থের লেখা রয়েছে।

তাওরাতের করিন্থিয় অধ্যায়ে সাইত্রিশ নম্বর শ্লোকে রয়েছে এভাবে-

'তারপর যা বুনেছো তাতে দেহ সৃষ্টি হবে। তা তুমি বুনো নাই। গম হোক বা অন্য খাবারের বীজ একটা মাত্র বুনেছো। আর পরম প্রভু তাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছে করেন তাই দেন। তিনি প্রতিটি বীজকে তার নিজস্ব শরীর দেন। সব শরীর একই ধরনের নয়। মানুষের, পশুর আর মাছের আলাদা।'

দু'ধরনের দেহ।

স্বর্গীয় ও পার্থিব।

দু'ধরনের প্রভা ভিন্ন রকম।

সূর্যের, চাঁদের আর নক্ষত্রের প্রভা আলাদা ধরনের।

এক তারার প্রভা অন্য তারার চেয়ে ভিন্ন।

মৃতদের জাগরণও তেমন।

অনাদরে যা বোনা হয় তা ক্ষণিকের।

যা উত্থান করা হয় তা চিরদিনের।

জড়দেহ বোনা হয়। আত্মার দেহ ওঠানো হয়।

দেহ দু'ধরনের। জড় ও আত্মিক।

প্রথম মানুষ আদম সজীব প্রাণ।

শেষ আদম জীবনদায়ক।

প্রথম মানুষ মাটি থেকে। দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে।

মাটির মানুষেরা পৃথিবীর মতো।

স্বর্গীয় মানুষেরা স্বর্গের মতো।

আমরা মাটির মূর্তি ধারণ করেছি। আমরা স্বর্গের মূর্তিও ধারণ করবো।

হে ভায়েরা!

রক্ত মাংস পরমপ্রভুর রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না।

দেখো আমি এক গোপন তত্ত্ব বলি, 'আমাদের সবার মৃত্যু হবে না। কিন্তু সবাই রূপান্তরিত হবো। এক পলকে। চোখের নিমেষে। শেষ তূরধ্বনিতে তা হবে। (শেষ বারের শিঙা)

কারণ তুরী বাজবে। তাতে মৃতরা চিরকালের হয়ে উঠবে।'

ইঞ্জিলের তাওরাত-সফনীয় অধ্যায়ে পনেরো শ্লোকে এভাবে লেখা রয়েছে-

'সেইদিন ক্রোধের দিন। সঙ্কটের ও সঙ্কোচের দিন। নাশের ও সর্বনাশের দিন। আঁধার ও তিমিরের দিন।'

ষোলো নম্বর শ্লোক-

'মেঘের ও গাঢ় তিমিরের দিন; তুর ধ্বনি রণনাদের দিন।'

সতেরো ও আঠারো নম্বর শ্লোকে-

'আমি মানুষের দুঃখ দেব। তারা অন্ধের মতো ঘুরে মরবে। কারণ তারা পাপী। তাদের রক্ত ধুলোর মতো হবে। তাদের গোশ্‌ত গলে যাবে মলের মতো। সেদিন তাদের রুপো আর সোনা কোনো কাজে আসবে না। . . . . ভয়ানক সংহারের দিন। সেদিন।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শিঙ্গা হলো একটা শিঙ। যার মধ্যে ফুঁ দেয়া হবে।'

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি কী করে সুখের জীবন কাটাবো? ওদিকে ঈসরাফিল ফিরিশতা মুখে শিঙ্গা নিয়ে কান পেতে, মাথা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ অপেক্ষায় যে কখন ফুঁ দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। (মিশকাত)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'যেদিন ফুঁ দেয়া হবে শিঙায়। সেদিন বড় কঠিন দিন। অবিশ্বাসীদের জন্যে বড় ভয়াবহ।' (সুরা মুদ্দাসসির)

আরো বলেন-

'আর শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে। তাতে জ্ঞানহারা হবে আকাশ ও পৃথিবীর সবাই। তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ চান। তারপর ফের ফুঁ দেয়া হবে তখন পলকেই তারা দাঁড়িয়ে যাবে। তাকাবে (অবাক হয়ে)। (সুরা যুমার)

হযরত আবু হুরাইয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ও দ্বিতীয় বার শিঙায় ফুঁ দেয়ার মাঝের সময় চল্লিশ সংখ্যার কথা বলেছেন। সবাই জিজ্ঞেস করলো চল্লিশ সংখ্যা কি? চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর?

উত্তরে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমার জানা নেই।'

দ্বিতীয় বার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে মানুষ কবর থেকে শাক সব্জির মতো উঠতে থাকবে।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মানুষের দেহের সব মাটিতে গলে মিশে যায়। একটা মাত্র হাড় বাকী থাকে। কিয়ামতের দিন ওই হাড় থেকে শরীর তৈরি হবে। তা হচ্ছে শিরদাঁড়ার হাড়।'

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষ জ্ঞানহারা হয়ে যাবে। এমনকি আমিও

তাদের সাথে বেহুঁশ হয়ে যাবো। তারপর সর্বপ্রথম আমার জ্ঞান ফিরে আসবে। তখন আমি দেখতে পাবো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে আছেন। আরশের একদিক আঁকড়ে ধরে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার জানা নেই, তিনি কি বেহুঁশ হবার পর উঠেছেন। না কি জ্ঞান হারাননি।'

জগতের একচ্ছত্র মালিক, পরমপ্রভু, বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন বলেন-

'মহাধ্বনির দিন! মহাধ্বনির দিন সম্পর্কে তুমি কী জানো? সেদিন মানুষ হবে এদিক সেদিক ওড়া দিশেহারা পোকার মতো। পাহাড়গুলো ধূনিত তুলোর মতো উড়াতে থাকবে।'

আরো বলেন-

'যখন পর্বতগুলো উড়ে যাবে।' (সুরা মুরসালাত)

আরো বরেন-

'পাহাড়গুলো চলতে থাকবে। তারপর মরিচিকার মতো হয়ে যাবে।'

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন-

'তুমি পাহাড়গুলোকে দেখে অচল মনে করছো। কিন্তু সেদিন ওরা হবে মেঘমালার মতো ভাসমান' (সুরা নাহাল)

'আর পাহাড়গুলো টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। যেন বালুর মতো।' (সুরা ওয়াকিয়া)

'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে আর তোমরা দলে দলে হাজির হবে। আকাশ খুলে যাবে। সেখানে অনেক দরোজা।' (সুরা নাবা)

'যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ ফেটে যাবে। আর অবতরণ করবে ফিরিশতারা।' (সুরা ফোরকান)

'যখন ফুঁ দেয়া হবে শিঙ্গায়; একটা মাত্র ফুঁ। তখন পাহাড়গুলো সহ জমিন উড়তে থাকবে। টুকরো টুকরো, গুঁড়ো হয়ে যাবে। সেদিন ঘটবে মহাধ্বংস। আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে আলাদা হবে। ফিরিশতারা থাকবে আকাশের কিনারায়। সেদিন মহাপ্রভুর আরশকে ধরে রাখবে আটজন ফিরিশতা।' (সুরা হাক্কা)

'সেদিন আকাশ ফেটে পড়বে। রক্তলাল চামড়ার মতো রূপ পাবে।'

'যখন আসমান ফেটে যাবে। তার প্রভুর হুকুম মানবে। এই তার কাজ। আর জমিনকে বড় করা হবে। পৃথিবী তার ভেতরে যা আছে বের করে শূন্য হয়ে যাবে। তার প্রতিপালকের আদেশ মানবে। এই তার কাজ। (সুরা ইনশিকাক)

আল্লাহ তায়ালা আকাশকে ফেটে চৌচির হবার আদেশ দেবেন।

তাই হবে।

জমিনকে চওড়া হবার নির্দেশ দেবেন।

তাই হবে।

জমিন টেনে রাবারের মতো বিস্তৃত করা হবে।

'যখন সূর্যের আলো নিভে যাবে। তারারা খসে পড়বে।' (সুরা তাকবীর)

'যখন আকাশ ছিঁড়ে যাবে। নক্ষত্রবীথি ঝরে পড়বে। এলোমেলো।' (সুরা ইনফিতারা)

'সে শুধায়, মহাপ্রলয় কবে হবে? যখন চোখ পলকহীন হবে। চাঁদ আলো ছাড়া। সূর্য আর চাঁদ এক হবে। মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার পথ কই?' না, সেদিন কোন ঠাঁই নেই।'

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন চাঁদ ও সূর্যকে ভাঁজ করে ফেলা হবে। তার আলো তুলে নেয়া হবে।'

'কিতাবুল বাসি ওয়ান্নসুর' নামের গ্রন্থে আল্লামা রায়হাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নকল করে বলেন, 'মহাপ্রলয়ের দিন সূর্য ও চাঁদের আলো নিভিয়ে তাকে দু'টুকরো করে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে।'

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি এ কথা শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন হবার কারণ কি?'

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'আমি তো শুধু রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শোনাচ্ছি। এর চেয়ে বেশি কিছু আমার জানা নেই।'

তাঁর কথা শুনে হযরত হাসান চুপ হয়ে গেলেন। (মেশকাত)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন-

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কবে কিয়ামাত হবে?

'তাদেরকে বলুন, একটা মাত্র ভয়াবহ ধ্বনি হবে, তা তাদেরকে তর্ক বিতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলবে।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন-

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে, কবে মহাপ্রলয় হবে?'

'তাদেরকে বলুন, এসবের খবর একমাত্র আল্লাহতায়ালাই রাখেন। তিনিই তা প্রকাশ করে দিবেন।'

হযরত ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম মোট তিনবার শিঙায় ফুঁ দিবেন। প্রথম বারে যাবতীয় প্রাণী ভয়ে আতঙ্কে জ্ঞানহারা হয়ে পড়বে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইয়াওমা নাত্‌বীস সামাই কাতাইয়িশ শিজিল্লিল কুতুব।'

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেবো, যেমন গোটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।'

বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহতায়ালা মহপ্রলয়ের দিন সাত আসমানকে আর তাদের মাঝে যা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে আর সাত জমিনকে তার সব জিনিস সহ গুটিয়ে এক করে দেবেন। সবকিছু মিলে আল্লাহতায়ালার হাতে একটা সরিষা দানার মতো হবে।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'হে মানব! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে! ওই বড় দিনের ব্যাপারে যেদিন দেখা দেবে ভয়ঙ্কর ভূকম্পন। সেদিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক দুধ পান করানো মা তার শিশুকে ভুলে গেছে; প্রত্যেক গর্ভবতীতার গর্ভপাত করবে। আর মানবকে তুমি দেখতে পাবে নেশাগ্রস্থ মাতালের মতো। আসলে তারা মাতাল নয়। তাদের প্রভুর ভয়ঙ্কর শাস্তি তাদের ধরে ফেলেছে!'

ঈসরাফিল আলাইহিস সালামের শিঙার প্রচন্ড শব্দে গোটা বিশ্বজগত প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। দুলতে থাকবে জমিন আসমান। কাঁপতে থাকবে পাহাড় পর্বত। উছলে উঠবে নদ নদী সাগর মহাসাগরের পানি।

প্রাণী জগত অধীর আর অস্থির হয়ে পড়বে।

জুমার দিন হবে।

মুহাররাম মাসের দশ তারিখ।

সুবহি সাদিকের সময় ফুঁ দেবেন ঈসরাফিল আলাইহিস সালাম। সুরেলা, মধুর সুর শুনবে জগতবাসী।

বেলা বাড়বে।

সুর কেটে যাবে।

মধুরতা নষ্ট হবে। তীক্ষ্মতা বাড়বে।

আওয়াজ আর তার কম্পন কর্কশ হয়ে উঠবে।

এতো কর্কশ আর বিদঘুটে হবে যে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। সবার চোখে একই প্রশ্ন, 'কোত্থেকে আসছে এমন শব্দ!'

একজন বলবে, 'উত্তর দিক থেকে!'

আরেকজন বলবে, 'দক্ষিণ দিক থেকে।'

কেউ বলবে পূর্বে।

কেউ বলবে পশ্চিমে।

জমিন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আকাশ লাল রঙ ধারণ করবে। ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে মানুষ। কারণ দাঁড়ানো, বসা, ও শোয়ার জায়গা লাল রঙ হয়ে ফেটে পড়বে।

শিঙার ধ্বনি কম্পন ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

পাহাড় কাঁপছে। মেঘের মতো ভেসে যাচ্ছে। ধূণিত তুলোর মতো।

চৌচির হয়ে যাচ্ছে মাটি।

ছুটতে শুরু করেছে মানুষ।

প্রাণের ভয়ে। দিগ্বিদিক।

যেদিকে যায় ভেসে আসে লাখ লাখ মানুষ। উল্টো দিক থেকে। হুড়মুড় করে। ভয়ার্ত, দিশেহারা। তারা চিৎকার করছে-

'এদিক নয়, ওদিক ওদিক-'

এই দলটি যেদিকে ছুটছে কিছুদূর যেতেই ঠিক উল্টো দিক থেকে ছুটে আসছে আরেকটি দল। পড়িমড়ি। পাগলের মতো। দৃষ্টি বিস্ফারিত! কারণ পেছন থেকে জমিন ফেটে ফাঁক হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁক বড় হচ্ছে। ক্রমশঃ। হাজার মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে গভীর খালের অতল অন্ধকারে।

মানব সন্তানেরা আজ কোন্ দিকে যাবে?

কোথায় আশ্রয়?

চোখের পলকে লক্ষ মানুষের আত্মা কবজ হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন-

'যখন ভূপৃষ্ঠ তার বোঝা উগরে বের করে দেবে।'

মানুষ বলবে, 'কি হলো পৃথিবীর?'

প্রচন্ড শব্দের তান্ডব মাটির ভেতরের খনিজ দ্রব্যকে টেনে বের করে ফেলবে। বা বমি করে দেবে মাটি। পৃথিবী তার কলিজার টুকরো বিশাল সোনার পিন্ড আকারে উদগীরণ করে দেবে।

তখন যে লোক ধন সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল সে বলবে, 'এর জন্যেই কি আমি এতো বড় অপরাধ করেছি!'

চুরির জন্যে যার হাত কাটা গিয়েছিল সে বলবে, 'এর জন্যেই আমার হাত আমি হারিয়েছিলাম?'

পাহাড় পর্বতে ফাটল ধরবে। চৌচির হয়ে যাবে। ভেঙে ভেঙে পড়বে। বিশাল আল্পস পর্বতমালা, বিশাল আন্ডেজ পর্বতমালা, সুবিশাল সিনাই পর্বতমালা, বিশাল হিমালয় পর্বতমালা চলতে শুরু করবে।

প্রথম ধীরে, পরে দ্রুতগতিতে।

যেমন রানওয়ের ওপর উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি হিসেবে ছুটতে শুরু করে। পরে ডানা মেলে উড়ে যায়। তেমনি পাহাড় পর্বত ছুটতে শুরু করবে। ফুঁ এর তান্ডবে। তারপর আচমকা উপর দিকে উঠতে শুরু করবে। মেঘের মতো ভেসে চলবে। প্রথমে সামান্য উপরে পরে মহাশূন্যে ভেসে যাবে। ধূণিত তুলোর মতো।

'অতাকুলুল জিবালু কাল্ ইহ্নিল মানফুশ।'

'পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে ধূণিত তুলোর মতো।'

'ইজাশ শামাউন ফাতারাত।'

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।'

সূর্যের মুখ কালো হয়ে যাবে। শুধু উত্তাপ থাকবে। কোনো আলো নেই।

'ওয়াইজাল কাওয়াকি বুন্তাসারাত।'

'ওয়াইজাল বিহারু ফুজ্জিরাত।'

'যখন সাগরগুলো ফুঁসে উঠবে।'

সাগর মহাসাগর উত্তাল হয়ে পাহাড় প্রমাণ ঢেউগুলো ছুটে আসবে স্থলভাগের দিকে।

'ওয়া-ইজাল কুবুরু বু'সিরাত।'

'যখন কবরগুলো খুলে যাবে।'

মানুষ দলে দলে পিঁপড়ার সারির মতো উঠে আসবে।

'ইজাশ শামসু কুব্বিরাত।'

'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।'

রবী ইবনে খায়সাম 'ইজাশ্ শামসু কুব্বিরাত' এর তাফসীর করেছেন। সূর্যকে ছুঁড়ে ফেলা হবে সমুদ্রে। প্রথমে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে।

সহীহ বোখারীতে আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিহীন করে তাদের অবস্থান থেকে ছিঁড়ে এনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে মহাসমুদ্রে। মুসনাদে আহামাদে আছে, জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে চাঁদ আর সুরুজকে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরো কয়েকজন তাফসিরবিদ বলেন যে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে আল্লাহতালা মহাসমুদ্রে ছুঁড়ে দেবেন। তারপর প্রবল বাতাস বইবে। আগুন ধরে যাবে মহাসমুদ্রে।

'ওয়াইজান্ নুজুমুন ক্বাদারাত।'

'যখন তারাদের আলো নিভে যাবে।'

'ওয়াইজাল জিবালু সুয়্যিলাত।'

'যখন পাহাড়গুলো চলমান হবে।'

'ইয়াওমা তারজুফুল আরদু জিবাল অ-কানাতিল জিবালু কাসিবাম মাহীলা।'

'যেদিন পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে। একটার উপর আরেকটা সংঘর্ষিত হবে। তারপর বালুর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

'ওয়াইজাল ইশারু উত্তিলাত্।'

'যখন দশমাসের গর্ভবতী উটের কোন মূল্য থাকবে না।'

আরবদের কাছে দশমাসের গর্ভবর্তী উট খুবই মূল্যবান ছিল। তারা এর বাচ্চার জন্যে অপেক্ষা করতো। চোখের আড়াল হতে দিত না। পৃথিবীর আকর্ষণ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। যেন ঘুম ভেঙে গেছে। এমন নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবে সেদিন মানুষ।

'অইজাল বিহারু শুয়্যিরাত্।'

'সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে।'

পানিতে আগুন নেভে। কিন্তু শিঙার প্রবল কম্পনে সমুদ্রে ধরে যাবে আগুন। যাতে মানুষ বেশি দিশেহারা হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু ও আরও বেশ ক'জন তাফসীরবিদ বলেন, 'তখন লোনা পানি ও মিষ্টি পানির দেয়াল ভেঙে যাবে। পানি একাকার হয়ে যাবে। চাঁদ, সুরুজ, তারা নিক্ষিপ্ত হবে। বাতাস বয়ে যাবে প্রবল। উত্তাল হয়ে উঠবে সাগর, মহাসাগর। প্রলয়ঙ্কারী রূপ ধারণ করবে। ধীরে ধীরে আগুন ধরে যাবে। মহাসমুদ্রে। দাউ দাউ করে। লেলিহান শিখা মেলে ধরবে।

'ওয়াইজান, নুফূসু জুব্বিজাত।'

'যখন মানুষকে জড়ো করা হবে।'

'ইজাশ শামাউন্ শাক্কাত।'

'যখন আকাশ ফেটে চিরে যাবে।'

"ওয়া আজিনাত্ লিরাব্বিহা অহুক্কাত্।'

'ও তার প্রভুর আদেশ পালন করবে। আর আকাশ এরই উপযুক্ত।'

'ওয়াইজাল্ আরদু মুদ্দাত।'

'আর যখন ভূপৃষ্ঠকে সম্প্রসারিত করা হবে।'

'ওয়া আলকাত্ মা ফিহা অ তাখাল্লাত্।'

'তখন পৃথিবী তার ভেতর লুকোন মহামূল্যবান ধাতু ও পদার্থগুলো বমি করে দেবে। নতুন পৃথিবী। তাতে থাকবে না কোনও বাড়িঘর, দালান কোঠা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র-মহাসমুদ্র, তরু-লাতা। সুবিশাল সমতল চত্বর।

'অইজাল আরদু মুদ্দাত।' মানে হচ্ছে টেনে লম্বা করা। অর্থাৎ সমতল ভূমিটিকে টেনে লম্বা করা হবে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পৃথিবীকে রাবারের মতো টেনে লম্বা করা হবে। তারপরও শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মানুষেরা সেখানে শুধু পা রাখার জায়গাটুকু পাবেন।'

ঠিক এমনি ভাবে সুরা আর রাহমানে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফাইজান্ শাক্কাতিশ শামাউ ফাকানাত্ ওয়ারদাতান্ কাদ্দিহান।'

'যেদিন আকাশ চৌচির হবে, লাল চামড়ার রঙ ধরবে। আর ফেটে মাটিতে ঝুলে পড়বে।'

তারাগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। ছিটকে পড়বে সমুদ্রে। সৌরমন্ডল পরস্পরের সাথে সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ঝরে পড়বে মহাসমুদ্রে।

'ইজা ওয়াকাআতিল ওয়াকিয়াত।'

'যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে।'

'লায়শা লিওয়াক্ আতিহা কাযিবা।'

'যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'খাফিদাতুর রাফিয়া।'

'এটা নিচু করে দিবে বা উঁচু করে দিবে।'

'ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা।'

'যখন প্রবল কম্পিত হবে পৃথিবী।'

'ওয়া বুশশাতিল জিবালু বাশশা।'

'পর্বতমালা গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'ফাকানাত হাবাআম্ মুম্ বাস্সা।'

'সেগুলো বালুকণার মতো উড়তে থাকবে।'

সেদিন বালক বৃদ্ধে পরিণত হবে। চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগবে। প্রবল কম্পনে বিশ্বজগত হেলতে দুলতে থাকবে। বিরতিহীন ভয়াল কম্পন! বেলা যত বাড়তে থাকবে ধ্বংসলীলা ততই বাড়বে। পাহাড়ে ফাটল, জমিনে ফাটল, বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। ওদিকে পাঁজর ভেঙে ফেলা শব্দতরঙ্গ কানে বাড়ি মারবে। ফেটে যাবে কানের পর্দা। ওদিকে আকাশ থেকে ভেসে আসছে বজ্রনিনাদ। মহাশব্দের দাপটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বস্তি, জনপদ, পাহাড় পর্বত। আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চিৎকারে নরক গুলজার। কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় ফুঁ দেয়ার সাথে সমস্ত প্রাণীকুল একসাথে মারা যাবে। মাত্র বারোজন সম্মানিত ফিরিশ্তা ছাড়া। আর ইবলিশ!

তার পিছু ধাওয়া করবেন আযরাইল আলাইহিস সালাম। সে দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটবে। শেষমেশ আদম আলাইহিস সালাম এর কবরের সামনে তার জান কবজ করা হবে।

এবার জলরাশি ধ্বংসের পালা।

তারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমার তরঙ্গরাজি ও আশ্চর্যজনক বস্তু তোমরা কোথায়?

আল্লাহর আদেশে তোমরা নিঃশেষ হয়ে যাও।'

পানি সাথে সাথে উধাও হয়ে যাবে।

এমন যেন কোনও দিন পানির অস্তিত্ব ছিল না।

এভাবে আগুন ও বাতাস ধ্বংস হবে।

সবশেষে আযরাইল আলাইহিস সালাম।



বারো

এবার আল্লাহরতায়ালা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করবেন 'লিমানিল মুলকিল্ ইয়াওম।' বলো আজকের দিনে

কে আছে। রাজত্বের মালিক? কে আছো রাজপুত্র? কোথায় রাজারা?

কোনও জবাব নেই। নিঃশব্দ দুনিয়া। নীরব পৃথিবী।

'লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার।'

একমাত্র ক্রোধান্বিত একক প্রভুই আছেন।'

তিনি। আল্লাহ।

একা।

বাকী সৃষ্টি?

হয়ে গেছে

চুপ।